বন্দিনী

তসলিমা নাসরিন

অল্প কথা

গত ২২শে নভেম্বর,২০০৭ তসলিমাকে তাঁর কলকাতার বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে রাজস্থানের জয়পুর পাঠিয়ে দেয় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার। সেদিনই রাজস্থান সরকার তাঁকে জয়পুর থেকে কলকাতায় ফেরত পাঠাতে চাইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সোজা তসলিমাকে নেবে না জানিয়ে দেয়। অতঃপর কেন্দ্রর হাতেই তসলিমাকে সঁপে দেওয়া হয়। কেন্দ্র এই সৎ এবং সাহসী লেখিকাকে একটি অজ্ঞাত জায়গায়, তথাকথিত *সেফ হাউজে* বন্দি করে রেখেছে। তসলিমার কোনও স্বাধীনতা নেই এক পা বাইরে বেরোবার, কোনও স্বাধীনতা নেই নিজের স্বজন বন্ধু বা পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা করার।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার তসলিমাকে গৃহবন্দি করে রেখেছিল দীর্ঘ চার মাস। ৯ আগস্ট থেকে ২১ নভেম্বর,২০০৭। ঠিক একই রকম ভাবে কেন্দ্র তাঁকে বন্দি করে রেখেছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের একমাত্র উদ্দেশ্য তসলিমাকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে, মানসিক ভাবে তাঁকে বিপর্যস্ত করা, যেন তিনি নিজে থেকে ভারত ছেড়ে চলে যান।

তসলিমা ভারত ছাড়তে বাধ্য হলে ভারতের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাক স্বাধীনতার আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হবে, হবে সংকীর্ণ মৌলবাদীদের বিশাল বিজয়। শুধু তসলিমার জন্য নয়, ভারতের গৌরব রক্ষা করার জন্যই তসলিমাকে তাঁর কলকাতার বাড়িতে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসকে যেন কেউ কলঙ্কিত করতে না পারে, এই দায়িত্বটি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের। এক নির্যাতিত নির্বাসিত বাঙালি লেখককে যদি এই বাংলা নিরাপদ আশ্রয় দিতে না পারে, তবে এ বাংলার লজ্জা, সকল বাঙালির লজ্জা।

প্রকাশক

সূচিপত্র

গৃহবন্দি কলকাতা

১. মৃত্যু
২. মাটি
৩. ঘাস
৪. শিউলি
৫. ঝরাপাতা
৬. অতলে অন্তরিন

গৃহবন্দি দিল্লি

৭. যে ঘরটিতে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে
৮. ভয়
৯. কয়েক বছর
১০. কোনও কবিকে কি কেউ গৃহবন্দি করেছিল কেউ
১১. সময়

১২. আমার শহর নয়
১৩. অন্তরিন
১৪. দেশ বলে কিছু কি থাকতে নেই আমার
১৫. ওরাই তাহলে পৃথিবী শাসন করুক
১৬. বাঁচো
১৭. মানুষ
১৮. সিসিইউ থেকে সিসিইউ
১৯. নো ম্যানস ল্যান্ড
২০. ভারতবর্ষ
২১. এমন দেশটি
২২. মুক্তি
২৩. আমরা
২৪. ছোটখাটো জিনিস
২৫. আমার বাংলা
২৬. প্রশ্ন
২৭. নিরাপত্তা
২৮. নিরাপদ বাড়ি

২৯. কন্যাটির কথা
৩০. দুঃসময়
৩১. সাফ কথা
৩২. নিষিদ্ধ বস্তু
৩৩. কলকাতার বাড়ি
৩৪. আশা দিও
৩৫. সাত মাসের শোকগাঁথা
৩৬. বাঁচা
৩৭. খুব উঁচু মানুষ
৩৮. মাসি
৩৯. আমি ভালো নেই, তুমি ভালো থেকো প্রিয় কলকাতা
৪০. ওই গোলাপ, ওই জল
৪১. আজ যদি গান্ধিজী বেঁচে থাকতেন
৪২. বাঙালি
৪৩. বইমেলা
৪৪. ভয়ংকর
৪৫. গুডবাই ইন্ডিয়া
৪৬. সেইসব দিন ১
৪৭. সেইসব দিন ২
৪৮. দিক-দর্শন
৪৯. তারা কারা
৫০. দূরদৃষ্টিহীন
৫১. পরাধীনতা
৫২. ছি!
৫৩. নাম

উৎসর্গ

যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে
গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেন,
মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলেন,
মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেন, তাঁদের ------

গৃহবন্দি
কলকাতা
৯ আগস্ট - ২২ নভেম্বর,২০০৭

মৃত্যু

১

ঠিক জানালার ওপারেই দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু।

দরজা খুললেই চোখের দিকে কোনওরকম

সংকোচ না করে তাকাবে ,

বসলে পাশের চেয়ারটায় এসে বসবে,

বলা যায় না হাতও রাখতে পারে হাতে,

তারপরই কি আমাকে হেঁচকা টান দিয়ে নিয়ে যাবে যেখানে নেওয়ার!

কোথাও বসতে, শুতে, দাঁড়াতে গেলেই আমার মনে হতে থাকে

মৃত্যু আড়াল থেকে আমাকে দেখে দেখে হাসছে।

স্নানঘরে   জলের শব্দের মধ্যে মৃত্যুর শব্দ বাজতে থাকে,

চুপচাপ বিকেলে কানের কাছে মৃত্যু এসে তার নাম ঠিকানা জানিয়ে যায়,

গভীর রাতেও   মৃত্যুর স্তব্ধতার শব্দে বারবার ঘুম ভেঙে যায়।

যেই না ঘর থেকে বার হই, পায়ে পায়ে মৃত্যু হাঁটে

যেখানেই যাই যে বস্তি বা প্রাসাদে, মৃত্যু যায়,

ঘাড় যেদিকেই ঘোরাই, সে ঘোরায়,

আকাশ দেখি, সেও দেখে,

ভিড়ের বাজারে গায়ে সেঁটে থাকে,

শ্বাস নিই, মৃত্যু দ্রুত ঢুকে পড়ে ফুসফুসে

এত মৃত্যু নিয়ে কি বাঁচা যায়, কেউ বাঁচে?
মৃত্যু থেকে বাঁচতে আমাকে মৃত্যুরই আশ্রয় নিতে হবে,
এ ছাড়া উপায় কী!

২

আরও কদিন বাঁচতে দাও, কমাস দাও,
আরও কবছর দাও সোনা,
আর বছর দুয়েক, হাতের কাজগুলো সারা হলে আর না বলবো না।

যদি বছর পাঁচেক দাও, খুব ভালো হয়।
দেবে তো? কী এমন ক্ষতি তোমার করেছি,
মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোনও শব্দ উচ্চারণ করিনি,
একটি অক্ষরও কোথাও লিখিনি কোনওদিন!
বছর পাঁচেকে কতটুকু আর পারবো জমে থাকা কাজের পাহাড় নামাতে!
সাত আট বছর পেলে হয়তো চলে
চলে বলবো না, চালিয়ে নেব। চালিয়ে তো নিতেই হয় কাউকে না কাউকে।
দশ হলে মোটামুটি হয়। দশ কি আর দেবে তুমি সোনা?
তোমারও তো জীবন আছে, তুমি আর কতদিন বসে বসে প্রহর গুণবে!
প্রহর যদি গোনোই কিছুটা, যদি রাজি হও,
তবে শেষ কথা বলি, শোনো, দশ যদি মানো, তবে
দু বছর কী আর এমন বছর, দিলে বারো বছরই দিও,
জানি দেখতে না দেখতে ওটুকুও ফুরিয়ে যাবে।
জানি না কী! বছর বারো আগেই তো তার সাথে দেখা হল,
এখনও মনে হয় এই সেদিন, এখনও যেন চোখের পাতা ফেলিনি,

এখনও তাকিয়ে আছি, বারো বছর কী রকম মুহূর্তে কেটে যায়, দেখেছো?
ও মরণ, ও জাদু, ভালোবেসে পনেরো কুড়িও তো দিতে পারো,
ও-ও দেখতে না দেখতে   কেটে যাবে দেখো।
বছর পেরোতে কি আর বছর লাগে?

আমাকে   চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছো,
কী থেকে কী হয় কে জানে!
স্বাধীনতা থাকলে কী আর ভিক্ষে করতাম দিন!
যত খুশি যাপন করা যেত।
এখন চাইলেই   কেউ তো আর বাঁচতে দিতে রাজি নয়।
তুমিও ছড়ি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো গায়ের ওপর,
এখন কিছুই আর আগের দিনের মতো নেই। তুমিও তো বাঁচতে চাও,
মরণও বাঁচতে চায়।

আর আমি? এখন এক একটি দিন বাঁচি তুমি যদি করুণা কর,
এক একটি মাস বা বছর বাঁচি, যদি বাঁচাও।
জীবনের কাছে নয়, ঋণী যদি থাকি কারও কাছে, সে তোমার কাছে,
তোমার অনুগ্রহের কাছে।
ক্ষমাঘেন্না করে আরও কটা বছর বাঁচাও সোনা।
মৃত্যুর বিপক্ষে মনের খায়েশ মিটিয়ে দুকলম লিখে তবে মরি।

৩

রামদা বল্লম নিয়ে নেমেছে ওরা,

তলোয়ার নিয়ে,

বিষাক্ত সাপ নিয়ে

মাথায় ধর্মমন্ত্র,

বুকে ঘৃণা,

কোমরে মারণাস্ত্র,

আমাকে হত্যা করে ধর্ম বাঁচাবে।

কম নয়, হাজার বছর মানুষ হত্যা করে

ধর্মকে বাঁচিয়েছে মানুষ।

মানুষের রক্তে স্নান করে দেশে দেশে

এককালে ধর্ম ছড়িয়েছিল মানুষই,
মানবতার চেয়ে ধর্মকে চিরকালই মহান করেছে মানুষই।

ধর্মের পুঁথি মানুষই লিখেছে,
নিঃসাড় পুঁথিকে মানুষখেকো বানিয়েছে মানুষই।
ধর্মের হাত পা বাঁধা, মুখে সেলাই।
ছাড়া পেলে ধর্মও চেঁচিয়ে বলতো, *পাষণ্ডরা মর।*
প্রাণ থাকলে লজ্জায় আত্মহত্যা করতো ধর্ম,
করতো দুহাজার বছর আগেই,
করতো মানুষের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য।

৪.
ওপারে কেউ নেই কিচ্ছু নেই, ফাঁকা,
আসলে ওপার বলে কিছু নেই কোথাও।
মৃত্যু আমাকে কোনও পারে নিয়ে যাবে না, কোনও বিচার সভায় না,
কোনও দরজার কাছে এনে দাঁড় করাবে না, যে দরজা পেরোলেই
হয় পুঁজ,রক্ত আর আগুন, নয় ঝরনার জল, না-ফুরোনো আমোদ প্রমোদ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে আমার *বিদেয়* হয়ে গেলে
শরীর পড়ে থাকবে কিছুদিন শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে কাঁটা ছেঁড়া হতে,
হয়ে গেলে হাড়গোড় সের দরে কারও কাছে বেচে দেবে কেউ
ওসবও একদিন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়বে, ধুলো হবে,
ধুলোও নিশ্চিহ্ন হবে কোনও এক গোধুলিতে।

যাদের ওপারে বিশ্বাস, না হয় তারাই যাক, মৃত্যুকে চুম্বন করে
রত্নখচিত দরজায় কড়া নাড়ুক,
ভেতরে অপেক্ষা করছে অগাধ জৌলুস, অপেক্ষা করছে মদ মেয়েমানুষ।
আমাকে থাকতে দিক নশ্বর পৃথিবীতে, থাকতে দিক অরণ্যে, পর্বতে, উতল সমুদ্রে,
আমাকে ঘুমোতে দিক ঘাসে, ঘাসফুলে, আমাকে জাগতে দিক পাখিদের গানে কোলাহলে, সর্বাঙ্গে মাখতে দিক সূর্যের কিরণ, হাসতে দিক, ভরা জ্যোৎস্নায় ভালোবাসতে দিক, মানুষের ভিড়ে রোদে বৃষ্টিতে ভিজে হাঁটতে দিক, বাঁচতে দিক।

যাদের ওপার নিয়ে সুখ, তারা সুখে থাক,
পৃথিবীতে আমাকে যদি দুঃখ পোহাতে হয় হোক,
পৃথিবীই আমার এপার, পৃথিবীই ওপার।

৫.
জীবন জীবন করে পাগল যে হই,
দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বলেই তো সে,

তিনবেলা চোখাচোখি হয়, প্রেমিকের মতো মুচকি হাসেও,
জানি খুব ভালোবাসে সে আমাকে, জানি খুব কাছে পেতে চায়।

ওভাবে সে চুমু খেতে না চাইলে অত করে ভালোবাসতে চাইতাম বুঝি!
ওভাবে দাঁড়িয়ে না থাকলে আঁকড়ে ধরতাম বুঝি
অত শক্ত করে পায়ের আঙুলে মাটি?
ঠেকিয়ে রাখতাম পিঠ দেয়ালে? খামচে ধরতাম হাতের কাছে যা পাই?

ওভাবে আমাকে নাগাল পেতে বাড়িয়ে না দিলে হাত,
পাড়াপড়শি গ্রাম শহর নগর বন্দর জাগিয়ে উত্তরে দক্ষিণে
উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতাম না জীবনের খোঁজে।
ওভাবে যদি না দাঁড়িয়ে থাকতো মৃত্যু দরজায়,
একবারও চাইতাম না তাকে ঠেলে সরাতে,
পালাতে চাইতাম না কোথাও, বরং চরাচর খুঁজে তাকেই বাড়ি নিয়ে এসে বসতে দিতাম।

আগস্ট,২০০৭

মাটি

যার দিয়ে অভ্যেস, হাত পেতে কিছু নিতে গেলে আঙুলগুলো

গুটিয়ে আনে সে,
যার নিয়ে অভ্যেস, আঙুল ছড়ানোই থাকে তার, আঙুলের মাথায়
এক একটা হিরের মুকুট পরবে বলে, মনে মনে প্রার্থণা করে সে পাঁচশ আঙুল।

তুমি যখন ভালোবাসা দেবে বলছো আমাকে,
মুহূর্তে তোমার মুখখানাকে মনে হলো কোনওদিন দেখিনি এর আগে,
চারদিক কেমন, এমনকী কণ্ঠস্বরও বড় অচেনা ঠেকলো, কোনও অদ্ভুত গ্রহে আমাকে ছুড়ে দিল, সহস্র আলোকবর্ষ দূরে ছুঁড়ে দিল কেউ।
গাছের পাতাগুলো বাড়িঘরের মতো, বাড়িঘরগুলো শুকনো নদীর মতো,
সাপের মতো মাথার আকাশ, চাঁদ সূর্য কিছু নেই,
রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে কোত্থেকে কেউ জানে না।

আমাকে কিছু দেবে শুনে ভয়ে নিজের ভেতরে সেঁধিয়ে
কুন্ডুলি পাকিয়ে বসে আছি।
সমুদ্র সাঁতার কাটা আমি কুয়ো খুঁজছি লুকোতে
পেয়ে অভ্যেস নেই আমার, আমাকে দিও না কিছু।

তার চেয়ে চাও, কী চাই বলো,
জীবন উপুড় করে দেব।
পাওয়ার কথা ভুলেও তুলোনা। না পাওয়ার জন্যই জন্মায় কেউ কেউ।
পেয়ে সবার অভ্যেস থাকে না।ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করা আমাকেও কী রকম
কেঁচো করে নুন ছিটিয়ে গর্তে পাঠিয়ে দিচ্ছ,
অর্ধেক আকাশ দেবে বলেছো, এ সওয়া যায়, ভালোবাসা দেবে
কখনও বোলো না, ও নিয়ে মিথ্যেচার করে মানুষ মেরো না।

ঝুড়ি ঝুড়ি ভালোবাসা নিচ্ছ নাও,

তোমার কাছে কিছু তো চাইনি,

তুমি তো পুরুষ শত হলেও, ভালোবাসা কী করে দেবে শুনি!

সবার হৃদয়ে তো ও জিনিসের বীজ নেই। মাটি তো   উর্বর নয় সবার!

সেপ্টেম্বর ২০০৭

ঘাস

তার চেয়ে ঘাস হয়ে যাই চল,

তাকে বলেছিলাম, সে বলেছিল *চল।*

বলেছিল, *তুমি আগে হও, আমি পরে।*

বলেছিল, *তোমার ডগায় ছোট চুমু খেয়ে তারপর আমি।*

ঘাস হলাম, সে হল না। আমাকে পায়ে মাড়িয়ে অন্য কোথাও চলে গেল।

কোথায় কার কাছে কে জানে! ঘাসের কি সাধ্য আছে খোঁজ নেয়!

কোনও একদিন বছর গেলে শুনি

কোথাও সে বৃক্ষ হতে চেয়ে চেয়ে হয়েছেও,

আমি ঘাস, ঘাসই রয়ে গেছি, ফুল ফোটাই, দিনভর আকাশ দেখি, বাঁচি।

এদিকে দুটো লোক ঘুরঘুর করছে, *বৃক্ষ হবে, বৃক্ষ হবে?*

সে বুঝি পাঠালো বৃক্ষ হতে?   একলা লাগছে তাহলে এতদিনে?

লোক দুটো চাওয়াচাওয়ি করে। বলে, *কার কথা বলো?*

নাম বলি।   জীবনে শোনেনি নাম।

তবে কেন   বৃক্ষ হতে বলছো আমাকে?

হেসে বললো, *দেখতে রূপসী হবে, ফলবতী হবে।*

দূর দূর করে তাড়াই তাদের। আমার ঘাসই ভালো।

ঘাস হলে দুঃখ রাখার জায়গা অত থাকে না,
ঘাস হলে কার সাধ্য আছে গায়ে চড়ে চড়ে
আচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে।

আমি আমার মতো বৃষ্টি বাদলায় বাঁচি,
ঘামাচি গরমে বাঁচি।
আমার মতো রাতভর চাঁদ দেখে দেখে, চাঁদ থেকে
চুয়ে পড়া সুখ দেখে দেখে বাঁচি।
ভুল করেও কাউকে বলি না ঘাস হতে আর,
ভুল করে নিজেও কখনও বৃক্ষ হই না।

অক্টোবর ২০০৭

শিউলি

আশ্চর্য একটা গাছ দেখি পথে যেতে যেতে, যে গাছে সারা বছর শিউলি ফোটে।
গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল উপচে ওঠে,
শিউলি পড়ে শীত গ্রীস্ম বর্ষা সাদা হয়ে থাকে মাঠ।
তার কথা মনে পড়ে, শিউলির মালা গেঁথে গেঁথে
শীতের সকালগুলোয় দিত,
দুহাতে শিউলি এনে পড়ার টেবিলে রেখে চলে যেত।
শীত ফুরিয়ে গেলে দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস ফেলতো তাকে মনে পড়ে।

একবার যদি দুনিয়াটা এরকম হতে পারতো যে নেই সে আসলে আছে,
একবার যদি তাকে আমি কোথাও পেতাম, কোনওখানে,
তার সেই হাত, যে হাতে শিউলির ঘ্রাণ এখনও লেগে আছে,
এখনও হলুদ জাফরান রং আঙুলের ফাঁকে, ছুঁয়ে থাকতাম,
মুখ গুঁজে রাখতাম সেই হাতে।
সেই হাত ধরে তাকে নিয়ে যেতাম নতুন গাছটার কাছে,
মালা গেঁথে গেঁথে তাকে পরাতাম, যত ফুল আছে তুলে
বৃষ্টির মতো ছড়াতাম তার গায়ে।

দুনিয়াটা যদি এরকম হয় আসলে সে আছে,
শিউলির ঋতু এলে কোনও একটা গাছের কাছে সে যাবে,
মালা গেঁথে মনে মনে কাউকে পরাবে, দুহাতে শিউলি নিয়ে
কারও পড়ার টেবিলে চুপচাপ রেখে দেবে,
তাহলে পথে যেতে যেতে যে গাছটা দেখি, সেটায়
হেলান দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো, যতদিন ফুল ফোটে ততদিন।

অক্টোবর ২০০৭

ঝরাপাতা

ঝরাপাতাদের জড়ো করে পুড়িয়ে দেব ভেবেছি অনেকবার,
রাত হলেও যত রাতই হোক, আগুন হাতে নিই।
ওদের তাকিয়ে থাকা দেখলে গা শিরশির করে।
ঝরে গেলে কিছুর আর দায় থাকে না
যেমন খুশি ওড়ে, ঘরে বারান্দায় হৈ হৈ করে খেলে,
জানালায় গোত্তা খাচ্ছে, গায়ে লুটোপুটি, হাসছে,
কানে কানে বার বার বলে, *ঝরে যাও, ঝরো, ঝরে যাও।*
মন বলে কিছু নেই ওদের। তারপরও কী হয় কে জানে, আগুন নিভিয়ে দিই।

পাতাগুলো পোড়াতে পারি না, কোনও কোনও দিন হঠাৎ কাঁদে বলে পারি না,
গুমড়ে গুমড়ে কারও পায়ের তলায় কাঁদে।
কান্নার শব্দ দিগন্ত অবধি ছড়ানো শত শতাব্দির মরুময় নৈঃশব্দ
ভেঙে ভেঙে জলতরঙ্গের মতো উঠে আসে..

কেউ হেঁটে আসে, আমার একলা জীবনে কেউ আসে।
সে না হয় দুদণ্ড দেখতে এল, তবু তো এল।
সে না হয় কাছেই কোথাও গিয়েছিলো, তাই এল, তবু তো এল।

ঝরাপাতারা তাকে নিয়ে নিয়ে আসে, যতক্ষণ নিয়ে আসে,
ততক্ষণ জানি আসছে, ততক্ষণ নিজেকে বলি কাছেই কোথাও নয়, পথ ভুল করে নয়,
আসলে আমার কাছেই, বছরভর ঘুরে, ঠিকানা যোগাড় করে, খুঁজে খুঁজে
আমার কাছেই আসছে কেউ, ভালোবেসে।
ওই অতটা ক্ষণই, ওই অতটা কুয়াশাই
আমার হাত পা খুলে খুলে , খুলি খুলে, বুক খুলে গুঁজে দিতে থাকে প্রাণ।
বাড়ির চারদিক পাহাড় হয়ে আছে ঝরাপাতার,
পোড়াতে পারি না।
ডুবে যেতে থাকি ঝরাপাতায়, পোড়াতে পারি না।

অক্টোবর ২০০৭

অতলে অন্তরিন

তুমি আজকাল আমার বাড়িতে আসছো না আর। বাড়ি আসবে, আর
আততায়ীরা যদি আমাকে হত্যা করে, তোমার ভয়, কোনওদিক দিয়ে
কোনও গুলি ছিটকে তোমার গায়ে কোথাও লেগে যাবে।
মাঝে মাঝে ফোন কর, কেমন আছি টাছি জানতে চাও,
বাড়ি আসার কথা উঠতেই বল কী কী কারণে যেন ভীষণ ব্যস্ততা তোমার।
তুমি আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। শুধু বন্ধু বলি কী করে, প্রেমিক ছিলে।
কোনও কারণে ব্যস্ততা বাড়তেই পারে তোমার, ভেবে নিজেকে বুঝিয়েছি,
একা একা অন্তরীণে না হয় কাটালামই কিছু দিন। মানুষ তো দ্বীপান্তরেও
শখ করে মাঝে মাঝে যায়।যেদিন জানলাম, আমার বাড়ি না আসার

আসল কারণ তোমার কী, ভয়ে আমি কুঁকড়ে পড়ে থাকলাম,
আততায়ীর চেয়েও বেশি ভয় আমি তোমাকে পেলাম।

নভেম্বর ২০০৭

অজ্ঞাতবাস
দিল্লি
২৩ নভেম্বর ২০০৭ -

যে ঘরটিতে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে....

আমি এখন একটা ঘরে বাস করি, যে ঘরে বন্ধ একটা জানালা আছে,
যে জানালা আমি ইচ্ছে করলেই খুলতে পারি না।
ভারি পর্দায় জানালাটা ঢাকা, ইচ্ছে করলেই আমি সেটা সরাতে পারি না।
এখন একটা ঘরে আমি বাস করি,
ইচ্ছে করলেই যে ঘরের দরজা আমি খুলতে পারি না, চৌকাঠ ডিঙোতে পারি না।
এমন একটা ঘরে বাস করি, যে ঘরে আমি ছাড়া প্রাণী বলতে দক্ষিণের দেয়ালে
দুটো দুঃস্থ টিকটিকি। মানুষ বা মানুষের মতো দেখতে কোনও প্রাণীর এ ঘরে
প্রবেশাধিকার নেই।
একটা ঘরে আমি বাস করি, যে ঘরে শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয় আমার।

আর কোনও শব্দ নেই চারদিকে, শুধু মাথা ঠোকার শব্দ।
জগতের কেউ দেখে না, শুধু টিকটিকিদুটো দেখে,
বড় বড় চোখ করে দেখে, কী জানি কষ্ট পায় কিনা --
মনে হয় পায়।
ওরাও কি কাঁদে, যখন কাঁদি?

একটা ঘরে আমি বাস করি, যে ঘরে বাস করতে আমি চাই না।

একটা ঘরে আমি বাস করতে বাধ্য হই,

একটা ঘরে আমাকে দিনের পর দিন বাস করতে বাধ্য করে গণতন্ত্র,

একটা ঘরে, একটা অন্ধকারে, একটা অনিশ্চয়তায়, একটা আশংকায়

একটা কষ্টে, শ্বাসকষ্টে আমাকে বাস করতে বাধ্য করে গণতন্ত্র।

একটা ঘরে আমাকে তিলে তিলে হত্যা করছে ধর্মনিরপেক্ষতা।

একটা ঘরে আমাকে বাধ্য করছে প্রিয় ভারতবর্ষ.....

ভীষণ রকম ব্যস্তসমস্ত মানুষ এবং মানুষের মতো দেখতে প্রাণীদের সেদিন

দুসেকেণ্ড জানি না   সময় হবে কিনা দেখার,

ঘর থেকে যেদিন জড়বস্তুটি বেরোবে,

যেদিন পচা গলা একটা পিণ্ড। যেদিন হাড়গোড়।

মৃত্যুই কি মুক্তি দেবে শেষ অবধি?

মৃত্যুই বোধহয় স্বাধীনতা দেয় অতপর চৌকাঠ ডিঙোনোর!

টিকটিকিদুটো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে সারাদিন,

ওদেরও হয়তো দুঃখ হবে মনে।

গণতন্ত্রের পতাকা পেঁচিয়ে   প্রিয় ভারতবর্ষের মাটিতে

আমাকে পুঁতে দেবে কেউ, কোনও সরকারি লোক সম্ভবত।

সেখানেও ঘর পাবো, যে ঘরে চৌকাঠ নেই ডিঙোতে চাওয়ার,

সেখানেও ঘর পাবো, যে ঘরে শ্বাসকষ্ট নেই।

০৪.০১.০৮

ভয়

বন্দুক হাতে সেনারা ঘুরছে, চারদিকে,
মাঝখানে নিরস্ত্র আমি।
সেনারা কেউ আমাকে চেনে না, নিরস্ত্র নারীর দিকে
মাঝে মাঝে অদ্ভুত চোখে তাকায়।
কেউ জানে না এখানে হঠাৎ কী কারণে আমি!
ময়লা শরীর, মলিন কাপড়চোপড়, মনমরা উড়ুককু চুল,
গায়ে পায়ে শেকল নেই আমার, কিন্তু   কোথাও না কোথাও আছে,
টের পায় ওরা, চাইলেও দু পা এগোতে পারবো না টের পায়।
ওদের চোখের তারায় বীভৎস এক টের পাওয়া দেখি।

বন্দুকগুলো, জানে ওরা, ভয় দেখাতে,
বেয়নেটগুলো, বুটজুতোগুলো ভয় দেখাতে।
ভয় না পেলে ওরা আঘাত পাবে খুব,
কাউকে আঘাত দেওয়ার অধিকার আমার আইনত নেই।
ওরা যদি ওপরতলায় খবর পাঠিয়ে বলে, *এর তো দেখি ডর ভয় নেই।*
শেকল ভাঙতে চাইছে প্রাণপণে!

ওপরতলা আমাকে নির্ঘাত ফাঁসি দেবে। ফাঁসির দিনক্ষণ ঠিক হলে,

খেতে দেবে মাছের ঝোল, ইলিশ চিংড়ি ইত্যাদি।
যদি বলি, খাবো না!
ফাঁসির মঞ্চে উঠে যদি একটাও দীর্ঘশ্বাস না ফেলি?
গলায় দড়ি পরাবার পরও যদি ভয় না পাওয়ার দুঃসাহস আমার হয়?

০৪.০১.০৮

কয়েক বছর

কয়েকবছর ধরে আমি মৃত্যুর খুব কাছে, প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি
আমার মার সামনে, আমার বাবা, প্রিয় কিছু মানুষের সামনে বাকরুদ্ধ দাঁড়িয়ে
আছি কয়েক বছর।
কয়েক বছর ধরে আমি জানি না ঠিক বেঁচে আছি কি না,
কয়েক বছর ধরে বেঁচে থাকা এবং না থাকার ব্যাবধান কমে কমে
শূন্যে এসে সুতোর মতো নড়ছে।
কয়েক বছর ধরে আমার ভেতরে বাইরে যে মানুষটা বাস করে,
সে বীভৎস বোবা একটা মানুষ,
যার বৃক্ষ থেকে শেষ শুকনো পাতাটাও ঝরে গেছে,
জীবন থেকে জন্মের মতো বিদেয় নিয়েছে বসন্ত।
আমার যদি মৃত্যু হয় আজ রাতে, কেউ কিছু বোলো না,
শুধু কোথাও কোনও শিউলি গাছের নিচে একটা এপিটাফ পুঁতে দিও,
কয়েক বছর ধরে লেখা আমার এপিটাফ,
সাদা কাগজের গায়ে সাদা রঙে, সযত্নে লেখা এপিটাফ।

৫.১.০৮

কোনও কবিকে কি কখনও গৃহবন্দি করেছিলো কেউ?

কোনও কবিকে কি কখনও গৃহবন্দি করা হয়েছিলো কখনও?
কবি নিয়ে রাজনীতি অনেক হয়েছে হয়তো,
কবি নিয়ে ইট পাটকেলও হয়েছে,
আগুন হয়েছে,
কবিকে কেউ গৃহবন্দি করেনি, কোনও দেশ।
এই ভারতবর্ষ, এই সভ্যতা, এই একবিংশ শতাব্দি, কবিকে গ্রহণ করেছিলো,
মুহূর্তে বর্জনও করেছে এর বালখিল্য ধর্ম, এর নিষ্ঠুর রাজনীতি।
কোনও অপরাধ করেনি কবি, কবি আজ গৃহবন্দি।

কবি এখন আকাশ না দেখে দেখে জানে না আকাশ কেমন দেখতে,
মানুষ না দেখে দেখে জানে না মানুষ কেমন,
কবির সামনে এক জগত অন্ধকার ফেলে চলে গেছে তারা,
তারা আর এ পথ মাড়াবে না বলে গেছে।

আজ একশ পঞ্চান্ন দিন কবি গৃহবন্দি,
একশ পঞ্চান্ন দিন কবি জানেনা
হৃদয় আছে এমন কেউ পৃথিবীতে আর বাস করে কি না,

একশ পঞ্চান্ন দিন কবি জানে না, কবি বেঁচে আছে কি নেই।

কার কাছে সে তার দিনগুলো ফেরত চাইবে,
অন্ধকার সামনে নিয়ে বসে কবি ভাবে,
কে তার জীবনে দেবে রোদ্দুর ফিরিয়ে,
কে তাকে নিভৃতে   জীবনের মন্ত্র দেবে কোনও একদিন।

অন্তত সান্ত্বনা দিতে কবিকে তো বলুক মানুষ,
এর আগে গৃহবন্দি ছিল যারা, অধিকাংশই কবি ছিল--
নিঃসঙ্গতা থেকে মনে মনেও কিছুটা মুক্তি পাক সে।

১৯.০১.০৮

সময়

রাত তিনটেয় ঘুম ভেঙে গেলে এখন আর বিরক্ত হই না
রাতে ভালো ঘুম না হলে দিনটা ভালো কাটে না--এরকম বলে লোকে।
দিন যদি ভালো না কাটে, তাতে কি কিছু যায় আসে!
আমার দিনই বা কেন, রাতই বা কেন।
দিন দিনের মতো বসে থাকে দূরে, রাতও রাতের মতো,
ঘুমিয়ে থাকার গায়ে মুখ গুঁজে গুটিশুটি শুয়ে থাকে   *জেগে থাকা।*

এসব দিন রাত, এসব সময়, এসব দিয়ে আমার করার কিছু নেই,
জীবন আর মৃত্যু একাকার হয়ে গেলে কিছু আর করার থাকে না কিছু দিয়ে।
আমি এখন মৃত্যু থেকে জীবনকে বলে কয়েও সরাতে পারি না,
জীবন থেকে মৃত্যুকে আলগোছে তুলে নিয়ে রাখতেও পারি না কোথাও আপাতত।

১৯.০১.০৮

আমার শহর নয়

আমার শহর যাকে বলেছিলাম, সে শহর আমার নয়
সে শহর ধুরন্ধর রাজনীতিক, অসৎ ব্যবসায়ী, আর নারী-পাচারকারীর শহর।
বেশ্যার দালালের শহর, লুম্পেনের শহর। ধর্ষকের শহর এ শহর।
আমার শহর নয়, সে শহর কেউ খুন বা ধর্ষিতা হলে, অত্যাচারিত হলে কিছু-
যায়-আসে-না-দের শহর।

আমার শহর নয়, সে শহর মুখে-এক-মনে-আরেকদের শহর।
বস্তির না-খাওয়াদের পাশ দিয়ে নির্বিকার হেঁটে যাওয়াদের শহর,
ফুটপাথে মরে-থাকা-ভিখিরিকে আলগোছে ডিঙিয়ে যাওয়াদের শহর।
বিপদের আঁচ পেলে তড়িঘড়ি গা-বাঁচানোদের শহর।
অন্যায়ের স্তূপে বসে মুখ-বুজে-থাকাদের শহর। আমার নয়।
ইহ-আর-পরলোক-নিয়ে-বুঁদ-হয়ে-থাকাদের শহর, জ্যোতিষির শহর,
আখের-গুছোতে-ব্যস্ত-থাকাদের শহর, সুযোগসন্ধানীর শহর।
সে শহর আমার শহর নয়। কিছুতেই।
সে মিথ্যুকের শহর। কূপমণ্ডূকের শহর। ঠগ, জোচ্চোরের শহর,
আমার নয়। সে শহর সুবিধেবাদীর, স্বার্থান্ধর, পাঁড় ধর্মান্ধদের শহর।

তাদের শহরে আমরা গুটিকয় মুক্তচিন্তার মানুষ,
কিছু যুক্তিবাদী, প্রতিবাদী, কিছু সৎ, সজ্জন বড় ভয়ে ভয়ে বাস করি।

২১.০১.০৮

অন্তরিন

কখনও কোনওদিন যদি অন্তরিন হতে হয় তোমাকে,
যদি শেকল পরায় কেউ পায়ে, আমাকে মনে কোরো।
যদি কোনওদিন যে ঘরটিতে তুমি আছো
সে ঘরের দরজা ভেতর থেকে নয়,
বাইরে থেকে বন্ধ করে কেউ চলে যায়, মনে কোরো।

সারা তল্লাটে কেউ নেই তোমার শব্দ শোনে,
মুখ বাধা, ঠোঁটে শক্ত সেলাই।
কথা বলতে চাইছো, কিন্তু পারছো না।
অথবা কথা বলছো,   কেউ শুনতে পাচ্ছে না,
অথবা শুনছে, শুনেও গা করছে না,
মনে কোরো।

তুমি যেমন খুব চাইবে কেউ দরজাটা খুলে দিক,
তোমার শেকল সেলাই সব খুলে দিক,
আমিও তেমন চেয়েছিলাম,
মাস পেরোলেও কেউ এ পথ মাড়ায়নি,
দরজা খুলে দিলে   আবার কী হয় না হয় ভেবে খোলেনি কেউ।
মনে কোরো।

তোমার যখন খুব কষ্ট হবে, মনে কোরো আমারও হয়েছিলো,
খুব ভয়ে ভয়ে সাবধানে মেপে মেপে জীবন চললেও
আচমকা অন্তরিন হয়ে যেতে পারে যে কেউ, তুমিও।
তখন তুমি আমি সব একাকার, দুজনে   এক সুতো তফাৎ নেই,
তুমিও আমার মতো, তুমিও অপেক্ষা করো মানুষের,
অন্ধকার ঝেঁপে আসে, মানুষ আসে না।

২২.১.০৮

দেশ বলে কি কিছু থাকতে নেই আমার

এমনই অপরাধী , মানবতার এমনই শত্রু আমি,
এমনই কি দেশদ্রোহী যে দেশ বলে কিছু থাকতে নেই আমার!
দেশই তবে কেড়ে নেবে আমার বাকিটা জীবন থেকে আমার স্বদেশ।

দেশ দেশ বলে অন্ধের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ গোলার্ধ
পাহাড় সমুদ্র আর সারি সারি বৃক্ষ
অন্ধের মতো আকাশ চাঁদ কুয়াশা রোদ্দুর
অন্ধের মতো ঘাস লতাগুল্ম মাটি আর মানুষ হাতড়ে হাতড়ে দেশ খুঁজেছি।

পৃথিবী ফুরিয়ে অবশেষে জীবন ফুরোতে
দেশের তীরে এসে বসা ক্লান্ত পিপাসার্ত মানুষের নিশ্চিন্তিকে তুমি যদি
টেনে হিচড়ে তুলে নিয়ে যাও, আঁজলার জলটাও ছুড়ে দিয়ে
আমাকে মৃত্যুদণ্ড দাও, তবে কী নামে ডাকবো তোমাকে, দেশ?

বুকের ওপর মস্ত পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে
বুটজুতোর পা দিয়ে গলা পিষছো, খুঁচিয়ে তুলে নিয়েছো দুটো চোখ,
মুখ থেকে টেনে বের করে নিয়েছো জিভ, টুকরো করেছো,
চাবুক মেরে চামড়া তুলে নিয়েছো,
গুঁড়ো করে দিয়েছো পা,পায়ের আঙুল, খুলি খুলে মস্তিস্ক থেতলে দিচ্ছো,
বন্দি করেছো, যেন মরি, যেন মরে যাই,
আমি তবু দেশ বলেই তোমাকে ডাকি, বড় ভালোবেসে ডাকি।
কিছু সত্য উচ্চারণ করেছি বলে আমি দেশদ্রোহী,
মিথ্যুকের মিছিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তুমি চলবে বলে আজ আমি দেশদ্রোহী।

মানবতাকে যেন মাটি দিয়ে দিই নয়তো সাত আসমানে উড়িয়ে দিই--
তর্জনী তুলে   বলে দিয়েছো।
আর যা কিছুই থাক বা না থাক, দেশ বলে কিছু থাকতে নেই আমার।
আমার জীবন থেকে, তুমি দেশ, হৃদয় খুঁড়ে নিয়ে গেলে আমারই স্বদেশ।

২৩.০১.০৮

ওরাই তাহলে পৃথিবী শাসন করুক

ওদেরই তাহলে স্বাধীনতা দেওয়া হোক,
ওদের জন্যই খুলে দেওয়া হোক অতপর অস্ত্রাগার।
তলোয়ারগুলো তুলে নিক, কোমরে গুঁজে নিক পিস্তল,
হাতে হাত-বোমা, *দারুল ইসলাম* এর মন্ত্র মাথায়   নিয়ে ওরা
না হয় বেরিয়ে পড়ুক, যেদিকে যত মুরতাদ পাক মুণ্ডু কেটে নিক।
মেয়েদের মারুক,
মেরে ফেলুক।
নতমস্তক নারীদের গায়ে   বোরখা চাপিয়ে দিক,
ঘরবন্দি করুক।
ঘন ঘন পুত্র পয়দা করতে ঘরে ঘরে ধর্ষণ চলুক।

পৃথিবীর যত পুরুষ আছে, এক যোগে সবাই না হয় তালিবান হয়ে যাক,
আর্জেন্টিনা থেকে আইসল্যাণ্ড, মালদ্বীপ থেকে মরককো,
বাংলাদেশ থেকে বাহরাইন   ওদের দখলে চলে আসুক।
ইসলামের পবিত্র জমিতে পরম শ্রদ্ধায় মাথা ঠেকাক আমাদের জননেতাগণ।
মুকুট পরিয়ে দিক এক একটা জঙ্গির মাথায়।
কৃতকর্মের জন্য করজোড়ে   ক্ষমা প্রার্থণা করুক জননেতাগণ।
ধর্মান্ধর পা-ধোয়া পানি পান করে   পূণ্যবান হোক আমাদের জননেতাগণ।

২৪.০১.০৮

বাঁচো

সত্য বললে কিছু লোক আছে খুব রাগ করে,
এখন থেকে আর সত্য বোলো না তসলিমা।
গ্যালিলিওর যুগ নয় এই যুগ, কিন্তু
এই একবিংশ শতাব্দিতেও
সত্য বললে একঘরে করে সমাজ,
দেশছাড়া করে দেশ।
গৃহবন্দি করে রাষ্ট্র,
রাষ্ট্র শাস্তি দেয়,
সত্য বোলো না।

তার চেয়ে মিথ্যে বলো,
বলো যে পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘোরে,
বলো যে সূর্যের যেমন নিজের আলো আছে, চাঁদেরও আছে,
বলো যে পাহাড়গুলো পৃথিবীর গায়ে পেরেকের মতো পুঁতে দেওয়া,
বলো যে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে নারীকে বানানো,
বলো যে নারীর ঘাড়ের কী যেন একটা হাড় খুব বাঁকা।
বলো যে শেষ-বিচারের দিনে মানুষেরা সব কবর থেকে,
ছাই থেকে, নষ্ট হাড়গোড় থেকে টাটকা যুবক যুবতী হয়ে
আচমকা জেগে উঠবে, স্বর্গ বা নরকে অনন্তকালের জন্য জীবন কাটাতে যাবে।
তুমি মিথ্যে বলো তসলিমা।
বলো যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অগুনতি গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্ররাজি মিথ্যে,
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মিথ্যে, মানুষ চাঁদে গিয়েছিলো, মিথ্যে।

মিথ্যে বললে তুমি নির্বাসন থেকে মুক্তি পাবে,
তুমি দেশ পাবে, প্রচুর বন্ধু পাবে,

হাত পায়ের শেকল খুলে দেওয়া হবে, তুমি আলো দেখবে, আকাশ দেখবে।
একা একা অন্ধকারে হাঁমুখো মৃত্যুর মুখে ছুঁড়ে দেবে না তোমাকে কেউ।
তুমি সত্য বলো না তসলিমা,
বাঁচো।

২৫.০১.০৮

মানুষ

একটু মানুষ দেখতে দেবেন?
রাস্তার মানুষ? মানুষ হাঁটছে, হাসছে,
মানুষ ডানদিকে যেতে গিয়ে   কী মনে হল বাঁদিকে হেঁটে গেল,
মানুষ মাঠে, দোকানে, সিনেমায়, জলসায়, থিয়েটারে।
মানুষ দৌড়োচ্ছে।
মানুষ গাড়িতে, বাসে, ট্রামে, ট্রেনে,
মানুষ চলছে, দেবেন?

একটু মানুষ দেখতে দেবেন?
বাড়িঘরের মানুষ,
ভালোবাসছে, স্বপ্ন-দেখছে মানুষ?
ভাবছে। দেবেন দেখতে?

জানালার ফাঁক ফোকর দিয়ে যেটুকু ছিটেফোঁটা মেঘ বা রোদ্দুর
দেখা যায়, তা দেখেই বাঁচতে হবে,
মানুষ, ওঁরা বলে দিয়েছেন *হবে না*
আমার মানবজীবন এভাবেই পার করতে হবে মানুষবিহীন।

২৫.০১.০৮

সিসিইউ থেকে সিসিইউ

(করোনারি কেয়ার ইউনিট থেকে কলকাতা)

বাড়িঘর ছেড়ে,
প্রিয় বেড়াল ছেড়ে, বইপত্র, বন্ধুদের ছেড়ে,
নিজের জীবন ছেড়ে,
অনিশ্চয়তার বোঁটকা-গন্ধ-কাঁথায় মুখ-মাথা ঢেকে,
দিনের পর দিন পড়ে থাকা
কোথায় পড়ে থাকা কতদিন কিছুই না জানা
হৃদপিণ্ডকে দাঁতে নখে কামড়েছে ভীষণ।

তারপর তো হৃদয় স্তব্ধ হলে অগত্যা সিসিইউ।
যায় যায় জীবনকে কোনওমতে টেনে আনা হল,
ধুকধুক বুক ফিরে যেতে চায়, রুগ্ন শরীর ফিরে যেতে চায় ঘরে।
বেড়ালের কাছে, বন্ধুর কাছে, স্পর্শের কাছে প্রিয়,
সিসিইউ থেকে সিসিইউ যায় মন.... !

কে আর তোয়াককা করে হৃদয়ের!
সিসিইউ থেকে তুলে নিয়ে তাকে শোনানো হল
বড় গম্ভীর, গাঁ কাঁপানো স্বর, *অন্য কোনও দেশে চলে যাও, এ-দেশ ছাড়ো।*
কোথায় যাবো, কোথাও তো যাওয়ার নেই আর, মরলে এ মাটিতেই মাটি দিও,
মাটি খুঁড়ে দেখতে চাও তো দেখে নিও আমার শেকড়।

কারই বা কী দায় পড়েছে দেখার,
কারই বা দায় পড়েছে চোখের জলে ভেসে যাওয়া মানুষের
কাতরানো দেখে কাতর হওয়ার!

সিসিইউ থেকে আবার নির্বাসনে,
আবার অন্ধকারের গায়ে আবর্জনার মতো ছুঁড়ে
হাত ধুয়ে বাড়ি চলে গেলেন ওঁরা, ওঁরা খুব বড় বড় লোক,
হাতজোড় করে নতমস্তকে নমস্কার করি ওঁদের।

০৩.০২.০৮

নো ম্যানস ল্যাণ্ড

নিজের দেশই যদি তোমাকে দেশ না দেয়,
তবে পৃথিবীতে কোন দেশ আছে তোমাকে দেশ দেবে, বলো!
ঘুরে ফিরে দেশগুলো তো অনেকটা একইরকম,
শাসকের চেহারা চরিত্র একইরকম।
কষ্ট দিতে চাইলে একইরকম করে তোমাকে কষ্ট দেবে,
একইরকম আহলাদে সুঁই ফোঁটাবে,
তোমার কান্নার সামনে পাথর-মুখে বসে মনে মনে নৃত্য করবে।
নাম ধাম ভিন্ন হতে পারে, অন্ধকারেও ঠিকই চিনবে ওদের--
চিৎকার, ফিসফিস, হাঁটাচলার শব্দ শুনে বুঝবে কারা ওরা,
যেদিকে হাওয়া, সেদিকে ওদের দৌড়ে যাওয়ার সময়
হাওয়াই তোমাকে বলবে কারা ওরা।
শাসকেরা শেষ অবধি শাসকই।

যতই তুমি নিজেকে বোঝাও কোনও শাসকের সম্পত্তি নয় দেশ,
দেশ মানুষের, যারা ভালোবাসে দেশ, দেশ তাদের।
যতই তুমি যাকে বোঝাও এ তোমার দেশ,
তুমি একে নির্মাণ করেছো তোমার হৃদয়ে,
তোমার শ্রম আর স্বপ্নের তুলিতে এঁকেছো এর মানচিত্র।
শাসকেরা তোমাকে দূর দূর করে তাড়ালে কোথায় যাবে!
কোন দেশ আর দরজা খুলে দাঁড়ায় তাড়া খাওয়া কাউকে আশ্রয় দিতে!
কোন দেশ তোমাকে আর কোন মুখে দেশ দেবে বলো!

তুমি কেউ নও এখন আর,
মানুষও বোধহয় নও।

হারাবার তোমার বাকিই বা কী আছে!

এখনই সময় জগতকে টেনে বাইরে এনে বলে দাও,

তোমাকে ওখানেই দাঁড়াবার জায়গা দিক, ওখানেই ঠাঁই দিক,

দেশের সীমানা ফুরোলে ***কারও মাটি নয়*** বলে যেটুকু মাটি থাকে,

সেই অবাঞ্ছিত মাটিই, সেটুকুই না হয়   আজ থেকে তোমার দেশ হোক।

০৪.০২.০৮

ভারতবর্ষ

(সুমিত চক্রবর্তী শ্রদ্ধাভাজনেষু)

ভারতবর্ষ শুধু ভারতবর্ষ নয়, আমার জন্মের আগে থেকেই
ভারতবর্ষ আমার ইতিহাস।
বিরোধ আর বিদ্বেষের ছুরিতে দ্বিখণ্ডিত হওয়া, ভয়াবহ ভাঙন বুকে নিয়ে
উর্দ্ধশ্বাস ছোটা অনিশ্চিত সম্ভাবনার দিকে আমার ইতিহাস।
রক্তাক্ত হওয়া ইতিহাস, মৃত্যু ইতিহাস।
এই ভারতবর্ষ আমাকে ভাষা দিয়েছে,
আমাকে সমৃদ্ধ করেছে সংস্কৃতিতে
শক্তিময়ী করেছে স্বপ্নে।
এই ভারতবর্ষ এখন ইচ্ছে করলেই কেড়ে নিতে পারে
সব ইতিহাস, আমার জীবন থেকে আমার অস্বিত্ব,
আমার স্বপ্ন থেকে আমার স্বদেশ।

নিঃশেষ করতে চাইছে বলে আমি আজ নিঃস্ব হব কেন!
ভারতবর্ষ তো জন্ম দিয়েছে মহাত্মাদের।
আজ তাঁরা হাত রাখছেন আমার ক্লান্ত কাঁধে,
এই অসহায়, এই অনাথ, এই অনাকাঙ্খিত কাঁধে।
দেশের চেয়েও দীর্ঘ এই হাত, দেশ কাল ছাপিয়ে এই হাত আমাকে
জাগতিক সব নিষ্ঠুরতা থেকে বড় মমতায় নিরাপত্তা দেয়।
মদনজিৎ সিং, মহাশ্বেতা দেবী, মুচকুন্দ দুবে -- তাঁদেরই আমি
দেশ বলে আজ ডাকি,
তাঁদের হৃদয়ই আজ আমার সত্যিকার স্বদেশ।

০৫.০২.০৮

এমন দেশটি ..

আমার দেশটি তাকিয়ে তাকিয়ে আমার যন্ত্রণা দেখছে আজ এক যুগেরও বেশি
আমার দেশটি দেশে দেশে আমার বন্দিত্ব দেখছে, দূরত্ব বেড়ে গেলে
দূরবীন লাগিয়ে দেখছে, বেজায় হাসছে,
পনেরো কোটি মানুষ তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করছে আমার সর্বনাশ।

আমার দেশ এমন ছিল না আগে,
দেশের হৃদয় বলে কিছু ছিল,
দেশে মানুষ বলে কিছু ছিল।

দেশ এখন আর দেশ নেই।
কতগুলো স্থবির নদী শুধু, কতগুলো গ্রাম আর শহর,
এখানে ওখানে কিছু গাছপালা, কিছু ঘরবাড়ি, দোকানপাট।
আর, ধুসর চরাচরে মানুষের মতো দেখতে কিছু মানুষ।

আমার দেশে এককালে প্রাণ ছিল খুব,
এককালে কবিতা আওড়াতো খুব মানুষ,
এখন কবিকে নির্বাসন দিতে কেউ দুবার ভাবে না,
এখন কবিকে মাঝরাত্তিরে নিশ্চিন্তে ফাঁসি দিয়ে ফেলে গোটা দেশ,
পনেরো কোটি মানুষ তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করে মর্মন্তুদ মৃত্যু।

দেশটি ভালোবাসতে জানতো আগে,
দেশ এখন হিংসে শিখেছে, চোখ রাঙানো শিখেছে
দেশের হাতে এখন ধারালো সব তলোয়ার থাকে, দেশের কোমরে গোঁজা

মারণাস্ত্র, মারাত্মক সব বোমা,
দেশ এখন আর গান গাইতে জানে না।

দুনিয়া তছনছ করে দেশ খুঁজছি এক যুগেরও বেশি,
এক যুগেরও বেশি ঘুম নেই, উন্মাদের মতো দেশ দেশ করে দেশের কিনারে এসে
দেশকে স্পর্শ করতে দু হাত বাড়িয়ে আছি।
আর শুনি কিনা, হাতের কাছে দেশ যদি একবার পায় আমাকে,
তবে নাকি আমার রক্ষে নেই।

০৭.০২.০৮

মুক্তি

তোমরা সবাই মিলে কিছু একটা দোষ আমার বার করো,
কিছু একটা দোষ তোমরা সবাই মিলে বার করো,
না হলে অকল্যাণ হবে তোমাদের।
সবাই মিলে তোমরা বলো কী কারণে আমাকে নির্বাসন দিয়েছো।
আমার জন্য কোথাও মড়ক লেগেছে; কোথাও শিশুমৃত্যু,
ধর্ষণ বা গণহত্যার মতো কোনও অপরাধ আমি করেছি,
এরকম কিছু একটা বলো,
নির্বাসনের পক্ষে অন্তত দুটো তিনটে যুক্তি হলেও দাঁড় করাও।

যতদিন না জুৎসই কোনও দোষ ধরতে পারছো,
যতদিন না কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ঘৃণার আঙুল
তুলে দেখাতে পারছো কুলাঙ্গারকে,
ততদিন কী করে ক্ষমা করবে নিজেদের!
কিছু একটা দোষ পেলে আমিও স্বস্তি পেতাম।
নির্বাসনকে অতটা নির্বাসন বলে মনে হত না।
কিছু একটা দোষ বার হোক আমিও চাই,
শুভাকাঙ্খী ভেবে তোমাদের ফের আলিঙ্গণ করতে আমিও চাই।

কী দোষে আমাকে সমাজচ্যুত করেছো, বলো।
কিছু একটা দোষ বার করো,
দোষ বার করে দোষ-স্খলন করো নিজেদের।
ইতিহাসকে কেন সুযোগ দেবে ভ্রুকূটি করার!
একখন্ড মধ্যযুগ এনে সভ্যতাকে কেন কলঙ্কিত করেছো,
কিছু কারণ বার করো এর।
না যদি পারো,

আমাকে বাঁচাতে নয়,
তোমাদের বাঁচাতেই আমাকে মুক্তি দাও,

০৮.০২.০৮

আমরা

কাল রাতে দেখি একটি টিকটিকি কোত্থেকে লাফিয়ে গায়ে পড়ে বাহু বেয়ে আমার ঘাড়ের দিকে চলে গেল, ঘাড় পার হয়ে মাথার দিকে, চুলের জঙ্গলে শরীর

আড়াল করে দ্বিতীয় টিকটিকির দিকে ঘন্টা দুয়েক অপলক তাকিয়ে থেকে ভোররাত্তিরের দিকে কানের পাশ দিয়ে নেমে শির-দাঁড়ায় গিয়ে বসে রইল। দ্বিতীয়টি স্থির শুয়ে ছিল আমার ডান পায়ের হাঁটু থেকে ইঞ্চি দুয়েক নিচে। সারারাত একচুলও নড়েনি। ওদের সরাতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে অগত্যা আমি যা করছিলাম, তাই করি, চোখ বুজে পড়ে থাকি। মনে মনে একশ থেকে এক অবধি বারবার করে গুনি। কোনও কারণ নেই গোনার, তারপরও গুনি।

যে বিছানায় আমি ঘুমোচ্ছি, দীর্ঘদিন হল সেটি আধোয়া কাপড়, এঁটো বাসন, হিজিবিজির খাতা, চায়ের দাগে বাদামি হয়ে থাকা পুরোনো পত্রিকা, চুল আটকে থাকা চিরুনি, মিইয়ে যাওয়া মুড়ি, খোলা ওষুধপত্র, কালি ফুরিয়ে যাওয়া কলম ইত্যাদির স্তূপ। দুশর মতো বড় বড় কালো পিঁপড়ে সারা বিছানা জুড়ে কদিন হল নোঙর ফেলেছে। আটঘাট বেঁধে লেগে গেছে নতুন বসত তৈরি করতে।

আমাকে দখল করে নিচ্ছে ওরা। ওরা খুব ক্ষুদ্র প্রাণী। কুঁকড়ে থেকে থেকে দিন দিন ওদের মতোই ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছি আমি।এ অবধি একটি পিঁপড়েও, আশ্চর্য, আমার শরীর জুড়ে উৎসব করছে ধ্রুপদী নৃত্যের, ভুলেও কামড় দেয়নি। আমাকে, আমার বিশ্বাস, ওদেরই একজন মনে করে ওরা!

সম্ভবত মানুষের জগতের চেয়েও এই পোকামাকড়ের জগতেই বেশি নিরাপদ আমি।

০৮.০২.০৮

ছোটখাটো জিনিস

নাওয়া

দিনের পর দিন যাচ্ছে, স্নান করি না।

মাস পেরোচ্ছে, গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে,

স্নানের তবু কোনও ইচ্ছে জাগে না,

কেনই বা স্নান করবো, কী লাভ স্নান করে..

এক অদ্ভুত অনীহা আমাকে অধিকার করে রাখে।

খাওয়া

তিনবেলা লোক আসে খাবার নিয়ে

পছন্দ হোক বা না হোক, খেতে হয়।

না খেয়ে যদি বাঁচা যেত--

বলে দিতাম কাল থেকে যাই দিক, অন্তত খাবারটা যেন না দেয়।

ঘুম

ঘুমোতে যাবার আগে ভয় হয়, যদি কিছু হয়!

যদি আর না জাগি!

ঘুমোলে চমকে চমকে বার বার উঠে যাই, আশেপাশে তাকাই,

আমার ঘর কি এ ঘর? না, এ আমার ঘর নয়।

নির্বাসন নেহাতই একটা দুঃস্বপ্ন, এ সত্যি নয়--

এই স্বপ্নটি সারাদিন দেখি,

ঘুমোলে স্বপ্ন যদি উবে যায়, ঘুমোতে ভয় হয়।

হাঁটাচলা

চার দেওয়াল ঘেরা ওই চতুষ্কোণ ঘরটির মধ্যেই
হাঁটাচলা করো যদি নিতান্তই করতে হয়---
এরকমই আদেশ এসেছে।
ঘর ঘরের মতো পড়ে থাকে, আমি এক কোণে আদেশে অবশ হয়ে,
স্তব্ধ বসে ভাবি, বিশাল বিস্তৃত এই পৃথিবী, কবে থেকে এত কৃপণ হল!

দেখা সাক্ষাৎ

জেলেও শুনেছি কিছু নিয়ম থাকে,
দেখা সাক্ষাৎএর সময় ইত্যাদি নাকি থাকেই,
আমারই কিছু নেই। স্বজন বন্ধু বলতে কিছু থাকতে নেই এক আমারই,
জেলের সুবিধে চেয়ে আবেদন করি প্রতিদিন, নিরুত্তর ভারতবর্ষ।

১১.০২.০৮

আমার বাংলা

আমার বাংলা আর বাংলা নেই,

সোনার বাংলা এখন ক্ষয়ে যাওয়া,
আমার রূপোলি বাংলার গায়ে মরচে,
পূর্ব পশ্চিম আজ একাকার।
ধর্মান্ধরা ছড়ি ঘোরায়, ভীতুরা মাথা নত করে হাঁটে,
নিশ্চিতই কবন্ধের যুগ এই যুগ।

সাহস আর সততার নির্বাসন হয়ে গেছে,
বাংলা এখন কুচক্রি শাসক আর তাবেদারে ঠাসা,
বাকিরা নির্লিপ্ত, জীবনযাপনকারী, হয় জড়, নয় জঞ্জাল।

এই বাংলার জন্য যত জল আমার দুচোখে আছে দিলাম,
কোনওদিন একদিন যেন উর্বর হয় মাটি, যেন   জন্ম নেয় *মানুষ,*
যেন দুর্ভাগা-বাংলা মানুষের   বাসযোগ্য হয় কোনওদিন একদিন।

১১.০১.০৮

প্রশ্ন

মরে গেলে লাশখানা রেখে এসো ওখানে,
মেডিক্যালের শব-ব্যবচ্ছেদ কক্ষে,
মরণোত্তর দেহদান ওখানেই করেছি,
রেখে এসো কলকাতা শহরে লাশ।

জীবিত নেবে না আমাকে ও শহর।
মরলে নেবে তো?   প্রিয় কলকাতা!

১৩.০২.০৮

নিরাপত্তা

এভাবেই, যেভাবে রেখেছে আমাকে, সেভাবেই থাকতে হবে, যদি থাকি,
যদি নিতান্তই থাকতে চাই এদেশে। এভাবেই কারাগারে, বন্ধ ঘরে, একা।
--কতদিন, কত মাস বা বছর?
--তার কোনও ঠিক নেই।
--কোনওদিন কি   জীবন ফিরে পাবো?
--ঠিক নেই।
--কী কারণ এই বন্ধ ঘরের?
--বেরোলেই   দেশের দশটা লোকের মৃত্যু হতে পারে।
চমকে উঠি। *--আমার কারণে?*
চোখ নিচু করে লোক বলে, *--হ্যাঁ।*
বলি, *--একবার মুক্তি দিয়েই দেখুন, দেখুন কতটা যুক্তিহীন এই অভিযোগ।*
ওদিকে মানুষ তো ভেবে বসে আছে, আমার জন্য বুঝি সব আয়োজন,
নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা আমার জন্য, আমি যেন না মরি!
কাউকে না কাউকে নিরাপত্তা দিতে, হয়তো এ পৃথিবীরই নিয়ম,
কাউকে না কাউকে হারিয়ে যেতে   হয় অদ্ভুত আঁধারে।

আমার বন্দিত্ব দশটা লোককে   নিরাপত্তা দিচ্ছে,
আমার বন্দিত্ব দশটা লোককে অভাবনীয় নিশ্চিন্তি দিচ্ছে,
খুব জানতে ইচ্ছে করে, কারা সেই দশজন?
তারা কি রাস্তার নাকি রঙিন-দালানবাড়ির লোক!
তারা কি আদপেই লোক, নাকি লোকেদের লোকাতীত লোকনীতি?
কাদের বাঁচাতে আজ আমাকে প্রতিদিন দেখতে হচ্ছে মৃত্যুর বীভৎস মুখ!

১৪.০২.০৮

নিরাপদ বাড়ি

এমন একটা নিরাপদ বাড়িতে আমাকে বাস করতে হচ্ছে
যেখানে ভালো না লাগলে বলতে পারার আমার কোনও অধিকার নেই
যে ভালো লাগছে না।
এমন একটা নিরাপদ বাড়ি যেখানে কষ্ট পেতে থাকবো আমি,
কিন্তু কাঁদতে পারবো না।
চোখ নামিয়ে রাখতে হবে আমাকে, কেউ যেন দেখতে না পারে
কোনও অমীমাংসিত যন্ত্রণা।
এমন একটা বাড়ি যেখানে ইচ্ছেগুলোকে প্রতিদিন ভোরবেলা খুন হয়ে
যেতে হয়, আর সন্ধের আগে আগেই বাড়ির উঠোনে পুঁতে দিতে হয়
ইচ্ছের মলিন মৃতদেহ।

দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস ফেলে নৈঃশব্দ ভাঙি নিরাপদ বাড়ির,
দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই বাড়ির বাইরে বা ভেতরে।
প্রতিদিন ভয়ে ভয়ে ঘুমোতে যাই, ভয়ে ভয়ে জাগি,
নিজের ছায়ার সঙ্গে যতক্ষণ জেগে থাকি মনে মনে কথা বলি।
জানি না কোত্থেকে বিষদাঁত-সাপ এসে থিকথিকে ক্রোধ আর ঘৃণা
ছড়াতে ছড়াতে সারাদিন আমার শরীর বেয়ে হাঁটাহাঁটি করে,
হিসহিস করে বলতে থাকে, *চলে যাও,*
সীমান্ত পার হয়ে দূরে কোথাও, কাক পক্ষী না দেখে
কোনও দুর্গম পর্বতের দিকে কোথাও চলে যাও।
ছায়াটির শরীর বেয়েও সাপ বলতে বলতে যায়, *যাও, জন্মের মতো যাও।*

বন্ধুরা, প্রার্থণা করো, *নিরাপদ বাড়ি* থেকে কোনও একদিন
যেন নিরাপদে বেরোতে পারি বেঁচে।

প্রার্থণা করো, যেন কোনও একদিন একটি *অনিরাপদ বাড়িতে* বাস করার সৌভাগ্য আমার হয়।

১৬.০২.০৮

কন্যাটির কথা

কন্যাটিকে ফেলে আসতে হয়েছে কলকাতায়,
নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে বসেছিল দীর্ঘদিন,
এখনও মলিন মুখে জানালায় বসে থাকে, দিন গোনে।

শীত কাটাতে হল একা একা,
নরম লেপের তলায় আমার উষ্ণতা পেতে পেতে
এ বছর আর ঘুমোনো হল না ওর ।
আমার অপেক্ষা করে ওর শীত গেল, ছুটির গরমকাল
যেন না যায়, যে-করেই হোক আমাকে ও চায়,
ফিরে পেতে চায় নিশ্চিন্তির দিন।

গড়িয়াহাট থেকে তুলে আনা শিশুটি কয়েকবছরে
ধীরে ধীরে বুকের ধন হয়ে উঠেছিল,
স্বজন বলতে এক আমিই ছিলাম ওর,
জগত বলতে এক আমিই।
আমার কিশোরী কন্যাটি তার ঘর বাড়ি, তার বিছানা বালিশ ছেড়ে
রোদ্দুরে ভেসে যাওয়া প্রিয় বারান্দাটি ছেড়ে, খেলনা-ইঁদুর ছেড়ে
মন-মরা বসে আছে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে,
দিন-শেষে চোখ ভেসে যেতে থাকে চোখের জলে।

কলকাতা, আমাকে দাওনি, আমার নিরাশ্রয় কন্যাটিকে আশ্রয় দিও,

আমাকে রাখোনি, আমার অনাথ কন্যাটিকে দেখে রেখো।

১৭.০২.০৮

(কলকাতায় ফেলে আসা পোষা বেড়াল মিনুকে মনে করে)

দুঃসময়

১.

কূপমণ্ডুকের দল বিপক্ষে গেলেও,
কট্টরপন্থীরা আস্ফালন করলেও,
কবন্ধরা ঘিরে ধরলেও,
মানুষ থাকে পাশে, শুভাকাঙ্খীরা থাকে।

যখন রাজ্য তাড়ায়,
যখন ক্ষমতা বিপক্ষে যায়,
যখন রাষ্ট্রযন্ত্র বিরুদ্ধে দাঁড়ায়,
মানুষ সরতে থাকে,   মানুষ পালায়।
শুভাকাঙ্খী বলে পরিচিতরাও নিরাপদ আড়াল খোঁজে,
প্রতিষ্ঠান সরে যায়, বেসরকারি ক্ষুদ্র দলও ক্ষুদ্র গর্তে লুকোয়,
স্বনামধন্যরা চোখ বুজে থাকে। বন্ধু বলে যাদের চিনি,
তারাও আচমকা অন্যত্র ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

হাতে গোনা কিছু মানুষ শুধু পাশে থাকে,

নির্ভেজাল কিছু মানুষ।

সাহস আর সততা সম্বল করে

সত্যিকার কিছু স্বার্থহীন বন্ধু থাকে পাশে।

২.

ওরা আজ মিছিল করছে,

ওরা মোমবাতি হাতে হাঁটছে সন্ধের শহরে,

জোট বেঁধে বিচার চাইছে অবিচারের।

কে বলেছে এই সংগ্রাম একার আমার?

বাক স্বাধীনতা রক্ষা হলে এদেশের মানুষেরই হবে,

এ আমার একার নয়, স্বপ্নবান মানুষের সবার সংগ্রাম।

এই দুঃসময়

আমার একার নয়, আমাদের সবার দুঃসময়।

যদি কোনওদিন জয় হয় মুক্তচিন্তার,

ব্যক্তি আমার চেয়ে শতগুণ হবে ভারতবর্ষের জয়।

এ আমার একার কিছু নয়,

আমার পাশে ওরা নয়, বরং ওদেরই পাশে,

ওই অবস্থান ধর্মঘটের পাশে, অনশনের পাশে,

ওই মিছিলের মানুষের পাশে,

ভারতবর্ষের পাশে, আমি আছি,

দূর কারাবাস থেকেও আছি,

ঘোর অনিশ্চয়তা আর অন্ধকার থেকেও আছি পাশে।

১৮.০২.০৮

সাফ কথা

তোমাকে তোমার বাড়ি থেকে ছিনতাই করে নিয়ে গেছে ওরা,
তোমার জীবন থেকে তোমাকে কেড়ে নিয়ে বন্দি করেছে ব্যালটবাক্সে।
কোনও স্বজনের একটি হাতও, সামান্য সুযোগ নেই, একবার স্পর্শ করো,
তোমারই জীবনের কণামাত্র তোমার অধিকারে নিয়ে
তোমার সুযোগ নেই একবার যাপন করো।
মানো বা নাই মানো, অন্যের সম্পত্তি এখন তুমি,
তোমার কিছুই আর তোমার নেই,
একঘর হাহাকার ছাড়া তোমার জন্য বরাদ্দ একফোঁটা কিছু নেই।
স্বাধীনতা সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারের ভূতুড়ে জিনিস।

ওদের ইচ্ছে তুমি উন্মাদ হও,
স্নায়ুতন্ত্রে যদি খুব শক্তি ধরো, উন্মাদ হতে যদি না-ই পারো,
তবে দেশ ছাড়ো, যে করেই হোক ছাড়ো, এ দেশ তোমার নয়।
মাটি কামড়ে কতদিন কে-ই বা পড়ে থাকতে পারে!
এত ঘৃণা, এত থুতু, এত লাথি
কতদিন সইতে পারে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখা মানুষ।

ওরা চাইছে, উন্মাদ যদি না-ই হও, দেশ যদি না-ই ছাড়ো,
অন্তত মরো।

তুমি সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছো গতকাল,
যা হয় তা হোক, আপাতত কোনওটিরই সম্ভাবনা নেই।
কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিনীত কণ্ঠে বলেছো, দিনে দিনে তোমাকে
অসম্ভব সহিষ্ণু করে গড়ে তোলার পেছনে অবদান ওদেরই।
এখন আগুনে পোড়ালেও তুমি পুড়ে পুড়ে আর
দগ্ধ হবে না, বড়জোর যদি কিছু হও   ইস্পাত হবে।

১৯.০২.০৮

নিষিদ্ধ বস্তু

আমি তো মানুষ ছিলাম, সমাজ সংসার ছিল, স্বপ্ন ছিল,
বারান্দার ফুলগাছ, বাজার হাট, বিকেলবেলার থিয়েটার,
বন্ধুর বাড়ি -- আর সবার মতো আমারও ছিল।
হঠাৎ কিছু লোক তুড়ি মেরে মুহূর্তে আমাকে
নিষিদ্ধ বস্তু বানিয়ে দিল!

কার কী নষ্ট করেছিলাম আমি?
কিছুই তো ছিল না আমার, শুধু ওই স্বপ্নটুকু ছিল,
ওই স্বপ্ন   সম্বল করে বেঁচে ছিলাম সুখে দুখে, নিজের মতো।
ব্যস্ত শহরের ভিড়ে, রোদে ভিজে, আর সব
মানুষের মতো আমার ওই সামান্য বেঁচে থাকাটুকু --
কেন কেড়ে নিতে হবে কারও!

নিষিদ্ধ বস্তুকে গর্তে পুরে রেখেছে রাজার লোকেরা।
ধর্ম-ধ্বংস-করা ডাইনিকে অবশেষে পাকড়াও করা গেছে---
ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে পুরো বিশ্বকে জানিয়ে দিচ্ছে খবর,
ধর্মান্ধদের হাঁ করা মুখে ঢেলে দিচ্ছে সুস্বাদু খাদ্য,
সন্ত্রাসীর জিভ থেকে ঝরানো হচ্ছে গনগনে লাভা।

কারও খেলার জিনিস তো নয়! আমার জীবন তো জীবন!
জনতার আদালত বলে কোনও আদালত কোথাও কি নেই?
২০.০২.০৮

আমার কলকাতার বাড়ি

বাড়িটা তুই, আছিস কেমন?
তোর বুঝি খুব একলা লাগে?
আমারও তো, আমারও খুব।
রাত্তিরে কি ভয় করে না?
জানলাগুলো হঠাৎ করে
ধরাস করে খুলে গেলে?
কেউ এসে কি দরজা নাড়ে?
ধুলোয় ধুসর ঘরবারান্দায়
কেউ ঢোকে কি, ভয় জাগে যে?
চোর ডাকাতের বাড় বেড়েছে!
নাকি হাওয়াই ঢোকে, ঝড়ো হাওয়া!
হাওয়াই বা কোথায় এখন,
সম্ভবত আমিই ঢুকি,
মনে মনে আমিই বোধহয়।
হেঁটে বেড়াই ঘরগুলোতে,
অন্ধকারে চিনতে পারিস!
পায়ের আওয়াজ বুঝিস কিছু?

বাড়িটা তুই, লেখার ঘরটা দেখে রাখিস,
সবকিছুই তো ওই ঘরে রে,
জীবনটাই লেখার জীবন,
ন-আলমারি বইপত্তর,
লেখাপড়ার দুনিয়াটা,
ওসব ছেড়ে ভালো থাকি!
মনে মনে আমিই বোধহয়
অশরীরি ঘুরি ফিরি
ফেলে আসা ঘরদুয়ারে

চোখের জল ফেলে আসি!
বারান্দার গাছগুলোতে
জল যে দেবে, কেউ তো নেই!
চোখের জলে বাঁচবে না গাছ?
চোখে আমার এক নদী জল,
এক সমুদ্র চাস যদি বল, পাঠিয়ে দেব,
বাড়িটা তুই, বেঁচে থাকিস।

তোকে ছাড়া নির্বাসনে
এক মুহূর্ত মন বসে না,
বেড়ালটাও   বাড়ি নেই,
খাঁ খাঁ করছে বাড়ির ভেতর,
ধুলোয় তুই ডুবে আছিস,
আঁচল দিয়ে মুছে দেব,
চোখের জলে ধুয়ে দেব,
অপেক্ষা কর, বাড়িটা তুই।
তুই কি আর   শুধুই   বাড়ি।
তুই তো আমার হারানো দেশ।
তুই তো আমার মাতৃভাষা।
তুই কি আর শুধুই বাড়ি!
এক যুগেরও বেশি সময়
বুকের ভেতর তোকে লালন
করেছি তুই জানিস তো সব।
দীর্ঘকালের স্বপ্ন তুই,
স্বপ্ন বলেই তোকে ডাকি,

বাড়িটা তুই, বেঁচে থাকিস,

আমায় একটু বাঁচিয়ে রাখিস।

২২.০২.০৮

আশা দিও

আশাগুলো একটু একটু করে
চোখের জলের মতো টুপটাপ ঝরে পড়ছে,
আশাগুলোকে উড়িয়ে নিচ্ছে নিরাশার লু হাওয়া।

এই কঠোর নির্বাসনে
স্বজন বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন।
কোনও অপরাধ না করে আমি অপরাধী,
যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হবে।

একটু আশার আশায় সারাদিন বসে থাকি,
কোনও ফাঁক ফোকড় দিয়ে   যদি ভুল করেও ঢোকে।
সারারাত জেগে থাকি, ধুলোর ওপরও উপুড় হয়ে
আশা বলে কিছু যদি আচমকা চিকচিক করে, খুঁজি।

কিছু নেই।

জীবন পেতে আছি,
পারো তো কিছু আশা দিও,
সামান্য হলেও ক্ষতি নেই, দিও।
মিথ্যে করে হলেও দিও, তবু দিও।

২৩.০২.০৮

সাত মাসের শোকগাঁথা

অপরাধীরা বড় নিশ্চিন্তে যাপন করছে তাদের জীবন,
ধাপ্পাবাজি, ধর্মব্যবসা , সবকিছুই দেদার চলছে,
বুক ফুলিয়ে পাড়ায় হাঁটছে,
আরও কী কী অপরাধ করা যায়, তার মতলব আঁটছে,
অপরাধীরা চমৎকার আছে ভারতবর্ষে,
তাদের গায়ে টোকা দেওয়ার দুঃসাহস কারও নেই।

তারা অন্যায় করেছে বলে, শাস্তি তারা নয়,   আমি পাচ্ছি,
আমি শাস্তি পাচ্ছি যেহেতু তারা আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে।
তারা আমাকে   দেশ ছাড়ার হুমকি দিয়েছে বলে,
আমাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করার ব্যবস্থা চলছে সাতমাস ধরে।
আমাকে হত্যা করার   বেআইনি ফতোয়া জারি করেছে বলে,
দেশের আইন ভেঙেছে বলে, তারা নয়, শাস্তি পাচ্ছি আমি!

অপরাধ করিনি বলে এখনও অপেক্ষা করছি।
দেখছি হেঁচকা টান দিয়ে   নিরপরাধের
গোটা জীবনটা তুলে কোথাও কোনও অজ্ঞাতস্থানে
ঝুলিয়ে রাখতে কতদিন পারে দেশ!
দেখছি একশ কোটি মানুষের দেশের
কতদিন লাগে অবশেষে মানবিক হতে!

এ দেশ আমার পূর্বপুরুষ বা পূর্বনারীর মাতৃভূমি বলে নয়,
এরই জল-হাওয়ায় আমার বেড়ে ওঠা বলে নয়,
এরই সংস্কৃতি আমাকে সমৃদ্ধ করেছে বলে নয়।
আমি মানুষ বলে দাবি, মানুষের হয়ে দাবি ---
ভারতবর্ষকে ভালোবেসে এই দাবি---
অপরাধীকে শাস্তি-না-দেওয়া যদি   নীতি হয়, হোক,

নিরপরাধকে নির্যাতন করার নীতি যেন না হয় এ-দেশের।

২৪.০২.০৮

বাঁচা

অথৈ অন্ধকারে, অদ্ভুত অজ্ঞাতবাসে

পড়ে থাকা অসার আমার কাছে কেউ নেই আসে।

চাঁদের দিকে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকি,
মানুষের কাছে, আশ্চর্য, চাঁদও শিখেছে ফাঁকি।
জীবনে অমাবস্যা ঢেলে দিয়ে পূর্ণিমা পালায়,
পেছনে দৌড়ে দৌড়ে কত ডাকি, আয়, ফিরে আয়।
চাঁদের কী আসে যায়!
মানুষের কাছে দুদণ্ড ইদানীং মানুষই থাকে না,
দূরত্ব খোঁজে আত্মার আত্মীয়, জন্ম জন্ম চেনা!

দক্ষিণ থেকে উতল হাওয়ারা ছুটে ছুটে ছুঁতে আসে,
হাওয়াই ভরসা ছিল অতপর অজ্ঞাতবাসে।
হা কপাল! হাওয়াও উজার করে হাহাকার দিল,
জীবনে যা কিছু ছিল বা না-ছিল, নিল।

আকাশের কাছে কিছুই চাই না, ও আর কী দেবে?
দিলে এক শূন্যতা দেবে!
ও আমার যথেষ্ট আছে, ও নিয়েই আছি,
ও নিয়েই ভারতবর্ষের অজ্ঞাতবাসে বাঁচি।

২৫.০২.০৮

খুব উঁচু মানুষ

(শিবনারায়ণ রায়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

একটি মানুষ ছিলেন আমার পাশে,
আমার যে কোনও দুঃসময়ে তিনি পাশে ছিলেন,
পৃথিবীর যে প্রান্তেই ছিলাম, ছিলেন,
নির্ভীক লড়াকু মানুষটি প্রশাসন আমার পাশে নেই,
প্রতিষ্ঠান পাশে নেই পরোয়া করেননি, তিনি ছিলেন।
এত উঁচু মানুষ ছিলেন তিনি, তার নাগাল পাওয়া,
তার বিদগ্ধ চোখদুটোয় তাকানো সহজ ছিল না কারও।

এই সেদিনও, আমার এই ঘোর দুঃসহ বাসে,
টুকরো টুকরো হয়ে আমার আর
আমার স্বপ্নগুলোর ভেঙে পড়ায়
এতটুকু কাতর না হয়ে বলেছিলেন,
লেখো, যেখানে যেভাবেই থাকো,
যে দেশেই, যে পরিস্থিতিতেই, লিখে যাও,
তোমার জীবন হলো তোমার কলম।

শিথিল হয়ে আসা হাতের কলম আমি আবার শক্ত মুঠোয় ধরেছি,
মানুষটি ছিলেন পাশে, আগুনের মতো ছিলেন।
গোটা পৃথিবীও যখন আমাকে ত্যাগ করে সরে যায়,
তখনও জানি, একজনও যদি কেউ সঙ্গে থাকেন, তিনি তিনি।

উঁচু মানুষেরা হারিয়ে যাচ্ছেন একা একা।
নির্ভীক নিঃস্বার্থর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে কমে শূন্য হচ্ছে,
এই ভীতু আর স্বার্থান্ধ আর ক্ষুদ্রদের পৃথিবীতে বড় একা হয়ে যাচ্ছি,
তাদের চিৎকারে, দাপটে বধির হচ্ছি,
তাদের রক্তচক্ষু দেখে দেখে বোবা।

উঁচু মানুষটি নেই,

শীতার্ত অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছে আমার নিঃসঙ্গ জগত।

২৬.০২.০৮

মাসি

(*বাংলাদেশ তসলিমার মা, পশ্চিমবঙ্গ তসলিমার মাসি* --অন্নদাশংকর রায়)

মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি ছিল,

একটা সময় এমন কথাও বলতো লোকে।
বন বাদাঁড় আর নদ পেরিয়ে, মাসির কোলে
এসেছিলাম কাঁদতে আমি মায়ের শোকে।

মাসিই কিনা কোল দিল না,
কাঁদার জন্য কাঁধ দিল না,
মাসির প্রিয় বুনো ফুল,
হঠাৎ হল চক্ষুশূল।
সকাল সন্ধে মাসিই তাড়ায়, মাসিই বলে মর গে যা,
কোথায় যাবে অনাথ মেয়ে, কোন মুলুকে খুঁজবে মা?

২৬.০২

আমি ভালো নেই, তুমি ভালো থেকো প্রিয় কলকাতা

ভালো নেই আমি, এভাবে কেউ কোনওদিন ভালো থাকেনি কোথাও।
এভাবেই তুমি আমাকে রেখেছো কলকাতা, এভাবেই নির্বাসনে,
এভাবেই একঘরে করে। এভাবেই অন্ধ কূপে।
পায়ের তলায় পিষছো প্রতিদিন, প্রতিদিন পিষছো পায়ের তলায়।

গলা টিপে ধরেছো কথা বলেছি বলে,
হাত কেটে নিয়েছো লিখেছি বলে।
কাউকে হত্যা করিনি, কারও অনিষ্ট করিনি, কারও দিকে পাথর ছুঁড়িনি,
মানবতার পক্ষে কিছু অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করেছি বলে
আমাকে তোমার পছন্দ নয়।

আমাকে উৎখাত করেছো আমার মাতৃভাষা থেকে,
উৎখাত করেছো আমার মাটি ও মানুষ থেকে,
উৎখাত করেছো জন্ম-জন্মান্তরের ইতিহাস থেকে,
উৎখাত করেছো ঘর বাড়ি বাসস্থান থেকে,
পৃথিবীতে আমার সর্বশেষ আশ্রয় থেকে।

আমি ভালো নেই তাতে কী!
তুমি ভালো থেকো,
তুমি বড় বড় কবির শহর,
সাহিত্যিকের শহর,
দার্শনিক শুভবুদ্ধির শহর,
ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রগতিশীল শহর তুমি, কলকাতা,
তুমি তো সংস্কৃতির পীঠস্থান, কলকাতা, তুমি ভালো থেকো।

তুমি সুখে থেকো প্রিয় কলকাতা,
নাচে গানে থেকো, উৎসবে আনন্দে, মেলায় খেলায় থেকো সুখে।

তুমি তো মহান, তুমি বিরাট, তুমি অট্টহাসি হাসো, জগত দেখুক।

২৮.০২.২০০৮

ওই গোলাপ, ওই জল

(ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়া অনিল দত্তকে--)

একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতিদিন এক থোকা
গোলাপ পাঠাতেন আমার কলকাতার বাড়িতে।

তিনি এ-দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন,
গণতন্ত্রের জন্য করেছিলেন,
বাক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তিনি,
তাঁর কাছ থেকে আমি গোলাপ পেয়েছি প্রতিদিন।

ক্ষমতার চাবুক মেরে যারা আমার মনকে
রক্তাক্ত করছে ,
জীবনকে, জীবনের সব স্বপ্নকে
প্রতিদিন রক্তাক্ত করছে,
তারা শুধু আমাকে নয়,
ওই স্বাধীনতা সংগ্রামীকেও রক্তাক্ত করছে চাবুক মেরে, প্রতিদিন।
তারা জানেনা স্বাধীনতা সংগ্রামীর ওই গোলাপের রঙ রক্তের চেয়েও লাল।

এখন আর গোলাপ নয়, এখন এক ঠিকানাহীন ঠিকানায়
প্রতিদিন আমার জন্য মনে মনে চোখের জল পাঠান তিনি,
এই জল দিয়ে আমার ক্ষতগুলোর শুশ্রূষা করি।
গোলাপের স্মৃতি থেকে বিশুদ্ধ সুগন্ধ বাতাস নিয়ে
এই শ্বাসরোধ করা পরিবেশে শ্বাস নিই।

এই স্বাধীন দেশের গোপন কুঠুরিতে
পরাধীনতার শক্ত -শেকলে বাঁধা
নির্বাসিত নিঃস্ব নারী,
তাকে আজ মুক্ত করার শক্তি নেই কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীরও।

স্বাধীনতা হয়তো এ জীবনে আমার দূরূহই হবে পাওয়া।
ওই গোলাপগুলোকে ডাকবো স্বাধীনতা বলে,
ওই চোখের জলগুলোই আমার স্বাধীনতা।

২৮.০২.০৮

বইমেলা

সারা বছর বসে থাকি এই মেলাটি আসবে বলে।

এই মেলাটির অলি গলির ভিড়ের মধ্যে

নতুন বইয়ের গন্ধে ঘ্রাণে, ধুলোবালির ধুসর হাওয়ায়,

হারিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি। এই মেলাটি আসবে বলে

আকাশপারের উতল হাওয়ায় ইচ্ছে মতো   ঘুড়ি ওড়াই।

বছর বছর এই মেলাটি আসে বলেই স্যাঁতসেঁতে এক ঘরের কোণেও

খুব গোপনে ভীষণ সুখে, স্বপ্নসহ বেঁচে থাকি।

আমার তো আর পুজো-আচ্চা, ঈদ-বড়োদিন নেই,
আমার একটি মেলাই আছে, প্রাণের মেলা,
এই একটি মেলায় মানুষ দেখি কাছের মানুষ,
সাত-নদী-জল সাঁতরে তবু একটুখানি ছুঁতে আসে।
এই মেলাটিই   ধর্মকর্ম, ধূপের কাঠি, ধানদুব্বো।
এই একটি পরব, একটি সুখ-ই, নিজের জন্য তুলে রাখি।
শিল্প-মেলায় আগ্রহ নেই, জুয়োর মাঠ, ব্যবসা পাতি,
সন্ধে হলে উৎসবে নেই, ককটেলে নেই।
এই একটি মেলাই একমাত্র।
এই মেলাটিই শৈশব দেয়, কৈশোর দেয়,
ব্রহ্মপুত্র পাড়ের সেসব এঁটেল মাটির আনন্দ দেয়।
এই মেলাটির সারা গায়ে   মাতৃভাষা,
মাথার ওপর স্নেহসিক্ত মায়ের আঁচল।
এই মেলাকেই অন্য অর্থে জীবন বলি।

এটিও তুমি কেড়ে নিলে?
স্বদেশহারা স্বজনহারা
সামান্য এই সর্বহারার   সবটুকু সুখ
বুকের ওপর   হামলে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে
এক থাবাতে ছিনিয়ে নিতে পারলে তুমি ভারতবর্ষ?
দাঁত বসিয়ে কামড় মেরে   ছিড়েই নিলে যা-ছিল-সব?
হৃদয় বলতে কিছুই কি নেই ভারতবর্ষ?
হৃদয় তবে কোথায় থাকে ভারতবর্ষ?

০১.০৩.০৮

আজ যদি গান্ধিজী বেঁচে থাকতেন

আজ যদি বেঁচে থাকতেন গান্ধিজী,
যে করেই হোক বন্দি শিবির থেকে
আমাকে উদ্ধার করতেন।
নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিতেন।
এ আমি হলফ করে বলতে পারি, দিতেন।
হৃদয় বলে যেহেতু তাঁর কিছু ছিল, তিনি দিতেন।

বাড়ির ঘর দোর উঠোন আঙিনায়
নিশ্চিন্তে হাঁটাহাঁটি, উছলে পড়া খুশি,

বিন্দু বিন্দু স্বপ্ন দিয়ে সাজানো সংসার-সমুদ্রে
আমার সঞ্জীবনী সাঁতার দেখে
বড় সস্নেহে হাসতেন তিনি।
হৃদয় বলে যেহেতু কিছু ছিল তাঁর, হাসতেন।
আমাকে আমার মতো যাপন
করতে দিয়ে আমার জীবন,
আমি নিশ্চিত, তিনি স্বস্তি পেতেন।

গান্ধিজী যদি বেঁচে থাকতেন আজ,
দেশের দুর্দশা দেখে তাঁর দুঃখ হত।
কালসাপের মতো ফুঁসে ওঠা অসহিষ্ণুতার সন্ত্রাস
বন্ধ করতে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের
ডাক দিতেন তিনি। নিশ্চয়ই দিতেন।

আমাকে আর কতটুকু,
মূলত দেশটাকেই বাঁচাতেন।

২৯.২. ২০০৮

বাঙালি

আমার মতো বাঙালিকেও
ভারতবর্ষ *বাংলাদেশি* বলে।
বাংলাদেশি বস্ত্র হয়, অস্ত্র হয়,
বাঙালি আবার বাংলাদেশি হয় কী করে?
বাঙালি কি   একাত্তরে জন্মেছে ওই দেশে?
নাকি হাজার বছর লালন করছে জাতিসত্তা
হাজার বছর বইছে রক্তে সংস্কৃতি!

বাংলাদেশ আজ   নাম পাল্টে ভুতুমপেঁচা হলে?

বাঙালি কি ভুতুমপেঁচি হবে?

পূর্ব বঙ্গের নাম বদলে পূর্ব পাকিস্তান,
সে নামটিও বদলে গিয়ে বাংলাদেশ হল,
দেশ পাল্টায়, নাম পাল্টায়,
ধর্ম কর্ম অনেক সময় ভীষণরকম পাল্টে যায়,
পলিটিক্স তো পাল্টে ফেলে
এক তুড়িতে অনেক কিছু।
ঐতিহ্য কি পাল্টে যায়?
অস্তিত্ব কি অস্ত যায় দেশের নামের শেষে?

নাম পাল্টে বাংলাদেশ বাঙাল হলেই শুধু
বাঙালিকে সঠিক নামে ডাকবে নির্বোধেরা।

২৯.০২.০৮

ভয়ংকর

বরং বাঘ টাঘ নিয়ে বলো,
কৃষ্ণসার হরিণ নিয়ে কথা বলো।
মানুষের কথা বলো না,
মানুষ খুব ভয়ংকর।

বাঘকে খোঁচাবে তো   রক্ষে নেই।
হরিণের গায়ে হাত তুলেছো কী   মরেছো।

মানুষকে খোঁচালে চলে,

বোমা মেরে উড়িয়ে দিলেও ঠিক আছে।

যে মানুষ যুক্তি দেখায়, তর্ক করে,

ভাবে,

ভাবনাটা ছড়ায়,

তারা মানুষ তো নয়, আগুন।

আগুন যে করেই হোক নেভাতে হয়।

যে মানুষগুলো জন্তুর মতো,

ভাবনা নেই,

বেশ আছে,

খায় দায় ঘুমোয়,

যেভাবে অন্যরা চলে, সেভাবে চলে।

ওদের বাঁচিয়ে রাখো।

জন্তুরা খায় দায় ঘুমোয়,

আর জঙ্গলের শোভা বর্ধন করে।

এই চিন্তাশক্তিহীন লোকগুলোও

লোকালয় শোভিত

করে আছে বহুকাল।

এরাই থাকুক বেঁচে। দুধে ভাতে।

চিন্তকদের কথা ছাড়ো,

কৌশলে বন্দি করো ওদের,

পারলে মেরে ফেলো!

ওদের কথা নয়,

বরং অন্য কথা বলো।

হরিণ টরিণ।

২.৩.০৮

গুডবাই ইন্ডিয়া

একটা কথা আমার মুখ থেকে শুনবে বলে সবাই বসে আছে।

একটা বাক্য শুনবে বলে বসে আছে,

দুটো শব্দ শুনবে বলে,

দুটো মাত্র শব্দ।

আতঙ্কে,

ভয়ে,

বিবর্ণ হয়ে,

কাঠ হয়ে,

যেন বলে ফেলি একদিন, গুডবাই ইন্ডিয়া।

দিন যাচ্ছে,
সপ্তাহ শেষ হচ্ছে,
মাস পেরোচ্ছে, মাসের পর মাস।
আমার মুখের দিকে কয়েকশ রক্তচক্ষু
কয়েকশ বছর আগে বন্ধ হয়ে থাকা পুরোনো ঘড়ির কাঁটার মতো স্থির,
ডানে বামে ওপরে নিচে সর্বত্র
বাদুরের কানের মতো উৎসুক কান,
জগতের সবচেয়ে মধুর শব্দদ্বয় শুনবে বলে,
গুডবাই ইন্ডিয়া।

আমি এখনও উচ্চারণ করছি না শব্দদুটো,
এখনও বিশ্বাস করছি সত্যে।
সততায়।
বিশ্বাস করছি সৌন্দর্যে।
শিল্পে।
সহমর্মিতায়।

যেদিন আমাকে উচ্চারণ করতে হবে শব্দদুটো,
যদি আমাকে করতেই হয়-----
দুচারটে ঘৃণাই যেদিন উথলে উঠে সুনামি ঘটাবে,
যদি ঘটায়ই----
মনুষ্যত্ব পায়ে পিষে ধর্মান্ধতার নিশান
ওড়াবে মানুষ শহর নগর জুড়ে যেদিন ----
যেদিন আমারই রক্তের ওপর আমি লাশ হয়ে ভেসে থাকবো,

ঠুকরে খাবে একপাল শকুন আমার ফুসফুস-----
যেদিন আমাকে উচ্চারণ করতেই হবে শব্দদুটো,
সেদিন যেন গভীর রাত্তির হয়,
আমাকে যেন দেখতে না হয় দেশটির মুখ,
দেখতে না হয়   দুপুরের শান্ত পুকুর,
আমগাছতলা, উঠোনের রোদ্দুর,
যেন ভুলে যাই দেশটির সঙ্গে কখনও আমার
কোনও আত্মীয়তা ছিল।

আমি এখনও উচ্চারণ করছি না শব্দদুটো,
এখনও প্রাণপণে পাথর করে রেখেছি জিভ।
আমি উচ্চারণ করতে চাইছি না
এখনও চাইছি ভালোবাসার জয় হোক।

০৪.০৩.০৮

তারা কারা

যাদের সঙ্গে বাস করবো বলে আমি অন্ধকূপে পড়ে আছি,
অপেক্ষা করছি,
এক একটা মুহূর্ত এক একটা যুগের মতো যদিও দীর্ঘ, করছি।

যাদের সঙ্গে বাস করবো বলে ত্যাগ করছি আনন্দ উৎসব,
জীবন যাপন,
সমাজ সংসার,
স্বাধীনতা,
যাদের সঙ্গে বাস করবো বলে শরীর ক্ষয় করছি,
ভেঙে গুঁড়ো হতে দিচ্ছি মন!
যাদের সঙ্গে বাস করবো বলে প্রতিদিন জল ফেলছি চোখের,
নিঃসঙ্গতার গায়ে
সারারাত ধরে
টুপটুপ ঝরে পড়ছে সে জল,
ভেসে যাচ্ছে বয়স,
যাদের সঙ্গে বাস করবো বলে বুকের মধ্যে বিশাল এক
প্রত্যাশার প্রাসাদ গড়েছি,
তারা কারা?

তারা কি আমাকে মনে করে একবারও?
কখনও হঠাৎ? কোনওদিন?
কাদের সঙ্গে বাস করবো বলে
ভয়ংকর দাঁতালের বিরুদ্ধে এক বিন্দু পিঁপড়ে হয়েও
লড়াই-এ   নেমেছি?
তারা কি আমার মতো ভালোবাসা জানে?
আদৌ কি তারা ভালোবাসে?

০৭.০৩.০৮

আমাকে কোনও একদিন

সেইসব দিন ১

কোনও বরফের দেশে, নির্বাসনে পাঠাবে ভারতবর্ষ।
জমে যেতে যেতে একটু তাপ চাইবো, সামান্য উত্তাপ,
দূর পরবাসে কে আছে যে দেবে কিছু!
স্মৃতিই যদি একমাত্র বাঁচায় আমাকে।

সেইসব দিনই যদি উত্তাপ দেয়, দেবে।
আমার মধ্য কলকাতার   আকাশ ছাওয়া
বেড়াল-বেড়াল- বাড়িটাতে,
বিকেল বেলা সুস্মিতা আসতেন কিছু না কিছু নিয়ে,
কোনওদিন রাবড়ি, কোনওদিন ধনে পাতার আচার।
গল্প বলতেন জীবনের, পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে কী করে তিনি তিনি হলেন।
স্বাতী স্বপ্নার তুমুল তারুণ্য , উস্রির উচ্ছাস,
ঢোলের মতো বাজতো ঘরদোরে।
শর্মিষ্ঠা নামের মেয়ে কত কত কবিতা আওড়ে
সন্ধ্যেগুলো   উজ্জ্বল করেছে।
বড় ভালোবেসেছিল শর্মিলা, বড় স্বজন ছিল শর্মিলা।
বর্ধমান থেকে জয়প্রকাশ চলে আসতেন,
হাতে সীতাভোগ, হাতে মিহিদানা, মুখে সলজ্জ   সম্ভাষণ।
হঠাৎ উদয় হয়ে সকৌতুকে জীবন বলতো রঞ্জন।
সুমিতাভে মগ্ন হওয়া সেই তীব্র বর্ষাগুলো।
আর সেইসব সুব্রতময় দিন!

বরফে জমতে থাকা আমার শীতার্ত নির্বাসনে
সেইসব দিনই যদি উত্তাপ দেয় দেবে।
জঙ্গিপুর থেকে গিয়াসউদ্দিন আসতেন,
চব্বিশ পরগনা থেকে মোজাফফর,
আমাদের চোখের সরোবরে স্বপ্ন সাঁতার কাটতো,

অবিশ্বাস্য সব সুন্দরের স্বপ্ন।

দেশ থেকে দাদা আসতো একতাল শৈশব নিয়ে,
কাঁধে করে উঠিয়ে আনতো দেশের বাড়ি,
দাদার গা থেকে গন্ধ বেরোতো হাসনুহানার।
হাসনুহানার ওই গন্ধই যদি উত্তাপ দেয়, দেবে।
দূর পরবাসে জমে জমে বরফ হতে থাকা
আমাকে কে বাঁচাবে আর,
যদি স্মৃতিই না বাঁচায়!
০৭.০৩.০৮

সেইসব দিন ২

বিখ্যাতদের সঙ্গে ওঠাবসা আমার কখনও ছিল না।

নামী নামী লোকেরা আমার আশেপাশে
খুব একটা ঘেসেনি কোনওদিন, অথবা সন্তর্পনে আমিই
দূরে দূরে থেকেছি ভয়ে বা সংকোচে।
আমার মতো করে তাই বাস করতে পারতাম   শহরে,
আমার মতো করে মাটিতে মাটির মানুষের সাথে।

সহজ সাধারণরাই   সাধারণত আমার স্বজন,
বাজারের ঝাঁকাওয়ালা, তরকারিওয়ালা,
মাছ কাটার টগবগে ছেলেরা, মাছওয়ালা,
চায়ের দোকানের বেজায় ভদ্রলোকটি
ধনঞ্জয়   ধোপা,
আর সেই মল্লিকপুর থেকে আসা মঙ্গলা,
সোনারপুরের সপ্তমী,
এদের ছেড়ে কোথায় কার কাছে যাবো?

ওদিকে দুর্গা প্রতিমার মতো মুনা,
কল্যাণী থেকে ছুটে আসা গার্গী,
মানসী মেয়েটির ওই একবার ছুঁয়ে দেখতে চাওয়া,
ছেড়ে কোথায় কোন নির্বাসনে যাবো আমি?

উঠোনের ঘাসে ফুটে থাকা মন-কাড়া ফুল,
মালিদা মালিদা, ও ফুলের নাম কী?
একগাল হেসে মালিদা কতদিন বলেছে,
ও ফুলের তো দিদি কোনও নাম নেই!
দিগন্ত অবধি কত মাঠ জুড়ে কত সুগন্ধ ছড়ানো
কত নামহীন ফুল,
ছেড়ে কোথায় কার কাছে যাবো?

০৭.০৩.০৮

দিক-দর্শন

ওদিকে ঐশ্বর্য,
ওদিকে   যশ খ্যাতি,
ওদিকে সম্মান।

ওদিকে গণতন্ত্র,

বাক স্বাধীনতা,

ওদিকে মুক্তচিন্তা,

মানবাধিকার,

ওদিকে সুস্থতা,

সমতা,

ওদিকে সুন্দর,

ওদিকে সততা।

ওদিকে নিশ্চিতি,

নিরাপত্তা,

ওদিকে যুক্তিবাদ,

ওদিকে জীবন।

এদিকে দারিদ্র,

এদিকে দুষণ,

দুঃশাসন,

এদিকে সন্ত্রাস,

এদিকে নির্যাতন,

এদিকে মিথ্যে,

ধর্মান্ধতা,

জড়বুদ্ধি।

এদিকে পশ্চাৎপদতা,

পরাধীনতা,

এদিকে বৈষম্য

এদিকে আতংক,

অনিশ্চয়তা,

মৃত্যু।

আমি কোনদিকে যাবো?
জগত বলছে ওদিকে যাও, বাঁচো,
ওদিকে সহমর্মিতা, স্বর্ণপদক,
এদিকে অবজ্ঞা, এদিকে অপমান।

আমি এদিকটাকেই   বেছে নিলাম।

৮.৩.০৮

দূর-দৃষ্টি-হীন

যারা দিচ্ছে কারাগারে   আমাকে পাহারা,
তাকায় বিস্ময় নিয়ে মাঝে মধ্যে তারা,
কী কারণে পড়ে আছি একা একা জেলে

জগৎ সংসার দূরে বহুদূরে ফেলে!
বুঝতে পারেনা তারা, চোখের তারায়
হয়তো   কফোঁটা   জল   কাঁপে করুণায়!
কানে কানে বারবারই প্রশ্ন করে যায়
কে বাঁচে এভাবে   স্বাধীনতা হীনতায়?

আমি কি বুঝিনা বুঝি? একা অন্ধকারে
বসে থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি বাড়ে হাড়ে।
কী করে এতটা ধৈর্য কোথায় পেলাম?
ধৈর্যের পরীক্ষা হলে কার বদনাম!
কে কার পরীক্ষা নেবে, মানবে কে হার!
আমাকে করেছে বন্দি ক্ষুব্ধ সরকার
পরীক্ষা আমার নয়, তাদের এবার,
কতদিনে করে দেখি বিষফোঁড়া পার।

ধৈর্যের যা কিছু বাধ, ভেঙে সর্বনাশ,
লাভ নেই টেনে ধরে ইস্পাতের রাশ!
আপাতত করে নিচ্ছে   ধর্মবাদ-চাষ
পরেরটা পরে হবে, পরে রাজহাঁস।
চুনোপুটি ধৈর্য ধরে বছর যাওয়াবে
তিমিরা সইবে কেন! আস্ত গিলে খাবে।

আমার না হয় আশা আজকাল ক্ষীণ।
ধর্মবাদের ফসল কোনও একদিন
তাদের তুলতে হবে নিজেদের   ঘরে,
ভরে যাবে সবকটা ঘর বিষধরে।

কালসাপগুলো পোষা দুধ কলা দিয়ে,
একেকজনকে   খাবে   গিলে বা চিবিয়ে।
সেদিনের কিন্তু খুব বেশি নেই বাকি,
যেদিন জানবে তারা নিজেদেরই ফাঁকি
দিয়ে গেছে দিন দিন মনোবলহীন
তুখোড় রাজনীতিক দূরদৃষ্টিহীন।

১০.০৩.০৮

ছি!

আমি জেলে থাকি তাতে কার কী !
এরকম কত লোক জেলে আছে!

অন্যায় করিনি তাতেই   বা কী!
কত নিরপরাধ মরে পড়ে আছে কতখানে!
ফাঁসি হয়ে যায় কত নির্দোষের,
যাবজ্জীবনও হচ্ছে তো প্রতিদিনই।
আমি কারাগারে এ আর এমন কী!
এ তথ্য নতুন নয়। অনেক লেখককে
শাসকেরা ভুগিয়েছে বিভিন্ন দেশে।
খুব কিছু অভিনব নয় কারাগার-বাস।
এরকম বলে দায়িত্ব এড়ান বড় বড় লোক।

হঠাৎ কখনও রহস্যময় মৃত্যুটি এসে গেলে
খবর বেরোবে, আপদ মরেছে অবশেষে
তাতেই বা কারও কিছুই কি যায় আসে!
কজন দাঁড়াবে জানতে মৃত্যুর কারণ,
প্রতিবাদ মিছিলে সাকুল্যে
কুড়িজন হবে লোক?

অভিজ্ঞতা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে বটে,
ক্ষমতাকে কম বেশি সবাই আমরা চিনি।
নির্বাসনে না গেলে মানুষ কি চেনা যায়!
এই মেরুদণ্ডহীনের দেশে
ভাবতে লজ্জা হয় ভালোবেসে বাস করি।
হাতে গোনা কিছু সৎ ও সাহসী মানুষ
হৃদয়ে রয়ে যাবে যতদিন বাঁচি,
এই দেশ থেকে আর প্রাপ্তির কিছু নেই।

১০.০৩.০৮

পরাধীনতা

অভিজ্ঞতার জন্য সবার অন্তত এক বার
নির্বাসনের জীবন ভোগের প্রচণ্ড দরকার।
পরাধীনতার কিছু না পোহালে স্বাধীনতা কী জিনিস

কী করে বুঝবে, কেই বা বুঝবে! মর্যাদা দেবে কেন!

স্বাধীনতা পেতে লড়াই করছি শৈশব থেকে প্রায়,
আমি বুঝি এর গভীর অর্থ, আবশ্যকতা কত।
জীবন দেখেছি বলে প্রাণপণে জীবন ফেরত চাই
অনেকের মতো নাহলে নিতাম পরাধীনতায় ঠাঁই।

স্বাধীনতা ভোগ যারা প্রতিদিনই করছে জানেনা এর
আসল মানেটা আসলে খুবই সামান্য কিছু কি না।
পরাধীনরাও গৃহস্থঘরে মরে পচে গলে যায়,
সারাজীবনেও জানতে পারেনা কী যে তারা অসহায়।

যুদ্ধ করেই বোঝাতে চাইছি যুদ্ধ করতে হয়,
স্বাধীনতা চাই সবাইকে দিতে, কেবল আমাকে নয়,
নিজে না ভাঙলে, নিজের শেকল কেউই ভাঙেনা এসে,
প্রয়োজনে পাশে মানুষ কোথায় দাঁড়াবে যে ভালোবেসে!

ধর্মতন্ত্র আমাকে ফাঁসিয়ে মিথ্যেকে দিল জয়
লক্ষ নারীকে পুরুষতন্ত্র বন্দি করেছে ঘরে,
বিক্রি হচেছ শত শত লোক ধনতন্ত্রের কাছে
স্বাধীনতা আজ দুর্লভ খুব দুর্ভাগাদের দেশে।

নাম

একটা সরল সোজা মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করছো তোমরা,
তার সত্য কথা বলা তোমাদের সহ্য হচ্ছে না,
তার সততা তোমাদের আর পছন্দ হচ্ছে না।
তাকে রাজ্য ছাড়া করেছো,
আচমকা তাকে তার ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছো
মিথ্যে ভয় দেখিয়ে বিমান বন্দরে,
ঘর বাড়ি যেমন ছিল, ওভাবেই এখনও পড়ে আছে,
যে বইটা পড়ছিলাম, সেটা ওভাবেই খোলা,
লেখার খাতাটাও ওভাবে,
কলমের নিব খোলা থেকে থেকে কালি শুকিয়ে গেছে সম্ভবত,
লেখকের কলমের কালি শুকিয়ে ফেলতে চাইছো তোমরা।
লেখককে তার লেখার ঘরে যেতে দিতে চাইছো না,
লেখককে বন্দি করেছো, যেভাবে কোনও
ঘৃণ্য হত্যাকারীকে বন্দি করো।
যেভাবে ফাঁসি দেওয়ার জন্য রেখে দাও দাগী আসামীকে,
সেভাবে আমাকে রেখে দিয়েছো,
কোথায় কোন গুহায় রেখেছো কাউকে জানতে দিচ্ছো না,
পৃথিবীর কাউকে না, আমাকেও না।

লেখককে ভাবতে দিতে চাইছো না,
লেখককে লিখতে দিতে চাইছো না,
লেখককে বাঁচতে দিতে চাইছো না,
তোমাদের না-চাওয়াগুলো স্পষ্ট দেখছে পৃথিবী।
ভাবনা কী!
তোমাদের বশীভূত লেখকেরা,

পোষ্য ঐতিহাসিকেরা
স্বর্ণাক্ষরে তো লিখেই রাখবে ইতিহাসে তোমাদের নাম!

১২.০৩.০৮

রেটিনোপ্যাথি

দুশ্চিন্তা কোরো না,
দুশ্চিন্তা করলে তোমার রক্তচাপ বেড়ে আকাশ ছোবে,
দুশ্চিন্তা করলে তুমি নির্ঘাত মরবে।
চিকিৎসক   বারবারই সাবধানবাণী আওড়াচ্ছেন।

কিন্তু কী করে দুশ্চিন্তামুক্ত হবো এই অজ্ঞাতবাসে,
একটা স্বাধীনচেতা মানুষকে জন্তুর মতো তুলে এনে
আচমকা খাঁচায় বন্দি করলে কী করে দুশ্চিন্তামুক্ত হবে সে!
খাঁচা থেকে আদৌ কোনওদিন মুক্তি পাবে কি না,
মানুষের কোলাহলে মানুষের মতো কোনওদিন
জীবনখানি   যাপন করতে পারবে কি না,
জানতে না পারলে দুশ্চিন্তামুক্ত কী করে হবে সে!
আলোর মানুষেরা কতদিন পারে অন্ধকারে
অন্ধের মতো সাঁতরাতে!

আমার শরীরে তীরের মতো বিঁধে রয়েছে দুশ্চিন্তা,
যতক্ষণ ওই খাঁচা থেকে মুক্তি নেই, ততক্ষণ তীর থেকেও নেই।
চিকিৎসক আজ গম্ভীর মুখে বলে দিলেন,
দুশ্চিন্তা থাবা দিয়ে ধরেছে   আমার দৃষ্টিশক্তি,
দুশ্চিন্তা আমাকে উপহার দিয়েছে দূরারোগ্য রেটিনোপ্যাথি।

তীরন্দাজদের উদ্দেশে বলি,
তোমাদের কালো কুৎসিত অন্ধকার আমার আলো কেড়ে নিয়েছে,
আমার চোখদুটো ফেরত দাও বাবুরা,

আশ্রয় চেয়ে কেঁদেছিলাম বাবুরা, আমি আশ্রয় চাই না,
দেশ ছিনিয়ে নিতে চাও আমার হৃদয় থেকে, নাও।

আমার আলোটুকু আমাকে ফেরত দাও বাবুরা।

১৩.০৩.০৮

ভারতবর্ষের উপহার

হৃদয়ে ভারতবর্ষ ছিল,
তা সয়নি ভারতবর্ষের,
সয়নি বলে শাস্তি দিল আমাকে,
শাস্তি হৃদরোগ।
চোখে ভারতবর্ষের স্বপ্ন ছিল আমার,
তা সয়নি ভারতবর্ষের,
সয়নি বলে শাস্তি দিল আমাকে,
শাস্তি অন্ধত্ব।
আমি যেন হৃদয়ে রোগ ছাড়া আর কিছু লালন করতে না পারি,
চোখে যেন অন্ধত্ব ছাড়া আমার আর না থাকে কিছু।

এত বড় শাস্তি আজ অবধি কেউ আমাকে দেয়নি,
পৃথিবীর সমস্ত ধর্মান্ধ মৌলবাদী মিলেও
যত ক্ষতি আমার ভারতবর্ষ করেছে গত সাড়ে সাত মাসে,
তার এক তিলও করতে পারেনি দীর্ঘ দুযুগ ধরে।
বাংলাদেশ আমাকে দেশ- ছাড়া করেছে,
কষ্ট পেয়েছি খুব, দেশ দেশ করে কেঁদেছি,
সেই দেশও আমাকে এত তিল তিল করে হত্যা করেনি,
সেই নিষ্ঠুর দেশও আমাকে মৃত্যুর মতো কঠিন শাস্তি দেয়নি।

ভারতবর্ষকে ভালোবাসার শাস্তি

নিজের জীবন দিয়ে পেতে হল।
এই জীবন থেকে নিবে গেল সমস্ত আলো,
প্রাণরস শুকিয়ে জীবন এখন বাতিল খড়কুটো,
এখন কাঁধের ওপর ভীষণ শকুনের মতো বসে আছে মৃত্যু,
এখন চোখের সামনে দাঁত কপাটি মেলে বীভৎস মৃত্যু,
ভারতবর্ষকে ভালোবাসার সর্বোচ্চ উপহার।

চেয়েছিলাম মানুষের অন্ধত্ব দূর করতে,
চেয়েছিলাম মানুষের মোহর করা হৃদয় থেকে
বৈষম্যের, হিংসের, অন্ধকারের আর অসুস্থতার
শেকড় উপড়ে ফেলে ভালোবাসা রোপন করতে।
আমার চাওয়ার শাস্তি আমাকে দিয়েছে প্রিয় ভারতবর্ষ।

এত বড় মৃত্যু পৃথিবীরও শক্তি হয়নি আমাকে দেয়,
গোটা পৃথিবীর চেয়েও বেশি শক্তিমান একা ভারতবর্ষ।
এই শক্তিকে নতমস্তকে পুজো করো তোমরা,
এই ক্ষমতাকে আশীর্বাদ করো দীর্ঘজীবী হতে।

আমি পরাজিত হলে যত জয় ধর্মান্ধের হবে,
তার চেয়ে বেশি হবে ভারতবর্ষের।
আমার আজ মৃত্যু হলে যত জয় ধর্মান্ধের হবে,
তার চেয়ে বেশি হবে ভারতবর্ষের।
আজ জয়ধ্বনি করো ভারতবর্ষ,

আজ সময় হয়েছে জয়ধ্বনি করার,

এক অনাথ অসহায় লেখককে,

এক মানবিক মানুষকে

মৃত্যু উপহার দিয়ে   সাড়ে সাত মাসের লড়াইয়ে

তুমি ভয়ংকরভাবে জিতে গেছো ভারতবর্ষ।

তোমাকে অভিবাদন।

১৬.০৩.২০০৮